২০২০
বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি

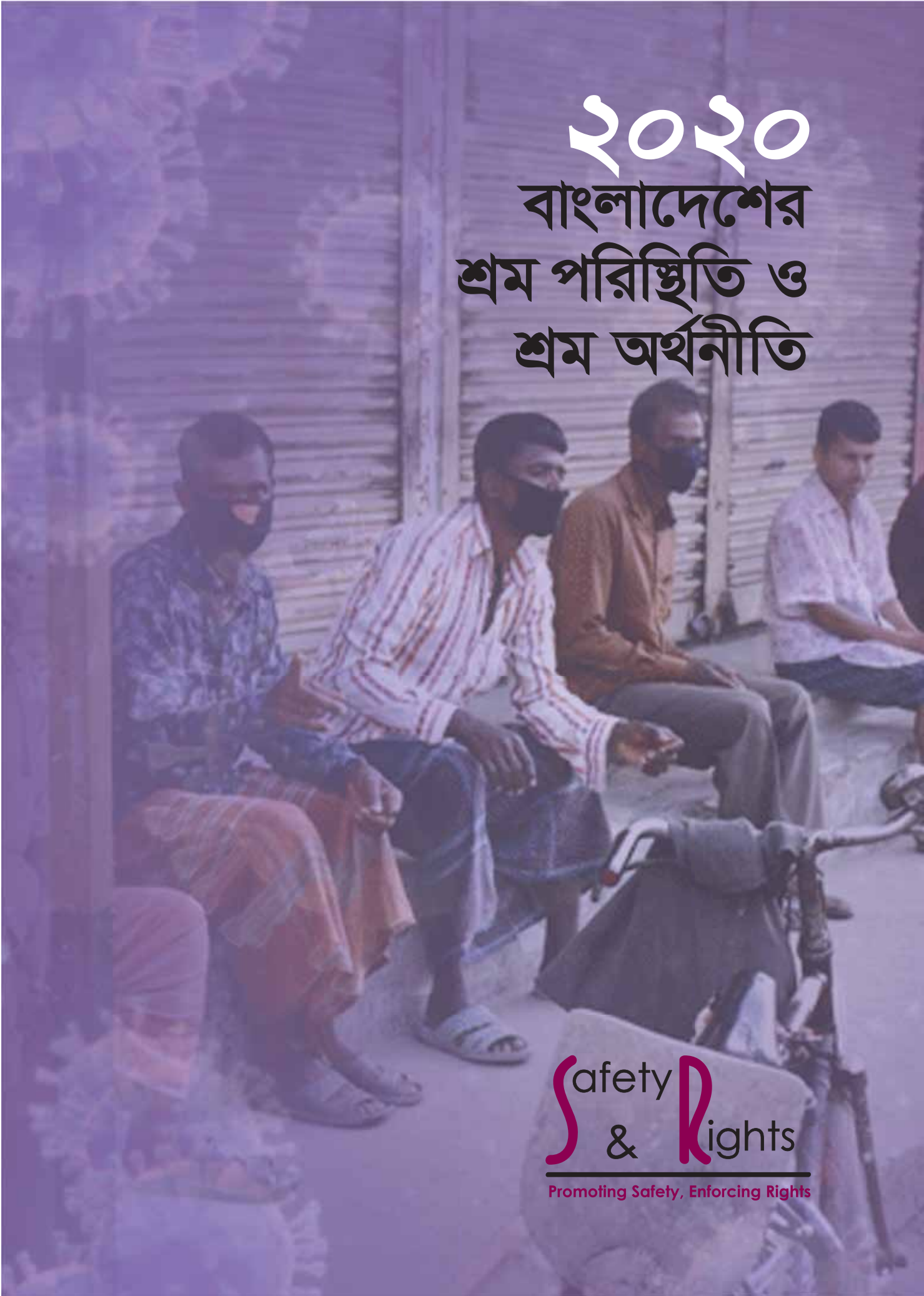

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি
ও
শ্রম অর্থনীতি
২০২০

Diakonia
People Change the World

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০২০

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি
র‍্যাংগস শ্রাবন্তি, ৬/৫ এ, স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন : +৮৮ ০২ ৯১১৯৯০৩-৪, মোবাইল: +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট: www.safetyandrights.org

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২১

স্বত্ব
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

আলোকচিত্র
ইন্টারনেট

দাম
১০০ টাকা

The State of Labour and Labour Economy of Bangladesh 2020

Documentation, Editing and Publication
Safety and Rights Society (SRS)
Rangs Shrabonti, 6/5 A, Sir Syed Road
Mohammadpur, Dhaka 1207
Mobile: +88 01974666890
info@safetyandrights.org
safetyandrights.org
Safety and Rights Society
Safety and Rights Society

Date of Publication
January 2021

Price
100 Tk.

Copyright
Safety and Rights Society (SRS)

ISBN : 978-984-34-9777-2

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	৫
শ্রমখাত ২০২০: প্রবণতাগুলো ছিল খারাপ	৭
জাতীয় বাজেট: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ সবচেয়ে কম	১১
গুটিয়ে গেল রাষ্ট্রীয় পাটশিল্প	১৫
পাটশিল্পের উন্নয়নে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)-এর প্রস্তাব	১৯
বিআইডিএস-এর গবেষণা: নতুন করে বিপুল মানুষ দরিদ্র হলো	২১
করোনাকালের অর্থনীতি ও সমাজ ভাবনা: চার অর্থনীতিবিদের চোখে	২৪
কোভিড-১৯ এর দিনগুলোতে পোশাক শিল্প	২৭
মহামারিতে লাখ লাখ গৃহশ্রমিক বেকার ও ঋণগ্রস্ত হলো	৩১
করোনায় চামড়া খাতে ছাঁটাইয়ে বাড়তি গতি	৩৩
কাজের বিজ্ঞাপন কমে গেছে; বিপুল বেকারত্ব	৩৫
করোনায় বহুমাত্রিক সংকটে প্রবাসী শ্রমিকরা	৩৮
মহামারিতে শিশু শ্রমিক ও বাল্যবিয়ে বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা	৪১
করোনায় নতুন করে ঋণগ্রস্ত নির্মাণ শ্রমিকরা	৪৩
ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞায় জেলেদের সমস্যা	৪৫
করোনায় অসুস্থ পাথরভাঙ্গা সিলিকোসিস রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা ব্যাহত	৪৭
শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ৪৭৭ কোটি টাকা জমা হলো	৫০
চা শ্রমিকদের মজুরি সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ?	৫২
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা কাদের কাছে যাচ্ছে?	৫৫
মহামারির মাঝে হু হু করে বাড়ছে কোটিপতি	৫৭
করোনাকালের নতুন পেশা: টিকে থাকার সংগ্রামে কর্মহারা মানুষ	৫৯
ঢাকায় দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বাসস্থান সমস্যার কিছু সুরাহা হলেও স্যানিটেশন ও চিকিৎসা সুবিধা এখনও অপ্রতুল	৬১
শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়ছে; মামলার জট কমছে না	৬৪
চুড়িহাট্টা আগুনের দু'বছর: পুরানো ঢাকা থেকে সরেনি রাসায়নিকের গুদাম	৬৬
রানাপ্লাজার পরের অধ্যায়	৭০
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শ্রমখাতের গতিশীলতা: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	৭৬
The labor sector in Bangladesh: Trends of 2020	৮০
The dynamics of the labor sector in recent years	৮৩

মহামারিকালের শ্রমজীবনের বৃত্তান্ত

শ্রমঅর্থনীতির ওপর সেইফটি এন্ড রাইটস-এর বাৎসরিক চতুর্থ প্রতিবেদন এটা। এবারের প্রতিবেদনও আমরা সময়মতো প্রকাশ করতে পেরেছি– মহামারির মাঝে যা সহজ ছিল না। কিন্তু মহামারি শ্রমখাতে যে নজিরবিহীন বিপর্যয় ঘটিয়েছে তার ফলে দ্রুতলয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন অপরিহার্যই ছিল।

নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় এবং বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম সূত্রে ইতোমধ্যে দেশবাসী অবহিত আছেন মহামারি আর্থ-সামাজিক জীবনে কীরূপ বিপর্যয় ঘটিয়েছে। কিন্তু এর মাঝেও শ্রমখাতের অবস্থা দেশবাসী তুলনামূলকভাবে কমই জানেন বলে মনে করি আমরা। কারণ জাতীয় পত্র-পত্রিকায় শ্রমখাতে করোনার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সামগ্রিক অবস্থার সামান্যই এসেছে।

করোনায় স্বাস্থ্যক্ষতি, অর্থনৈতিক ক্ষতি, আয়রোজগারের ক্ষতি সবই বেশি ঘটেছে শ্রমিকদের জীবনে। ভাইরাসের ছোবলে দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি যে ২০ শতাংশ থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ হয়ে গেল তারও প্রধান শিকার শ্রমিক-কর্মচারিরা। আমাদের বর্তমান প্রতিবেদনেও অনিবার্যভাবে মহামারিকালের শ্রমিক জীবনকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ খাতে মহামারির মাঝে শ্রমিকদের অবস্থা কী দাঁড়ালো এবং শ্রমজীবী মানুষ কীভাবে টিকে থাকার সংগ্রাম করছে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের উপস্থাপনা অভিমতধর্মী নয়– সেটা পাঠক টের পাবেন। আমরা মূলত তথ্য-উপাত্তের মাঝে নিজেদের সীমিত রাখার চেষ্টা করেছি। যেসব খাত ২০২০ সালে বিশেষভাবে আলোচনা ও মনযোগে ছিল সেসবকেই আমরাও গুরুত্ব দিয়েছি সংক্ষেপে। তবে পাশাপাশি এমন কিছু খাতের কথাও এসেছে যেখানে প্রচারমাধ্যমের মনযোগ ছিল কম। যেমন পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের উপর এই সংকলনে একটা প্রতিবেদন যুক্ত হয়েছে।

কথা ছিল, প্রতিবছরই আমরা বাৎসরিক প্রতিবেদনের পদ্ধতিগত দিক এবং বিষয়গত দিককে বিস্তৃত করার চেষ্টা করবো। সেই বিবেচনা থেকেই এবার প্রতিবেদনগুলোতে সারণী যুক্ত করা হয়েছে। এবং শ্রম অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে পৃথক একটা লেখা সংযুক্ত করা হয়েছে বাংলা ও ইংরেজিতে। এ বছর প্রাথমিকভাবে আমরা কাজটি শুরু করছি। আগামী বছর থেকে তথ্য–উপাত্ত এবং শ্রম–অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ ও সারণী আরও বেশি হারে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। বাংলাদেশে এ মুহূর্তে ৬-৭ কোটি মানুষ শ্রম অর্থনীতিতে রুজি রোজগারে সরাসরি যুক্ত। এই অর্থনীতি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে যেভাবে আলোচনা হয় তাতে প্রবৃদ্ধি ও জিডিপি'র হিসাব-নিকাশই বেশি গুরুত্ব পায়। আমরা মনে করি শ্রমিকদের জীবনের দিক থেকেও ঐ একই অর্থনীতিকে বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। সেইফটি এন্ড রাইটস সে চেষ্টা করতে চাইছে।

পাঠক জানেন, আমাদের বাৎসরিক এই প্রতিবেদন মূলত জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ও মতামতের আলোকে প্রণীত। তবে যে বিষয়টি এবার আমরা নতুন করে সংযুক্ত করেছি তাহলো সংবাদপত্রভিত্তিক প্রচেষ্টার বাইরে নিজেদের উদ্যোগে কিছু কিছু প্রতিবেদন তৈরি করে প্রকাশ করা। যেমন রানা প্লাজা ও নির্মাণ খাতের প্রতিবেদনটি সেইফটি এন্ড রাইটস নিজ উদ্যোগে প্রণয়ন করেছে। এভাবে আগামীতে শ্রম অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে নিজেদের অনুসন্ধান ও প্রকাশনার পরিসর আরো বাড়াতে চায় সেইফটি এন্ড রাইটস। আমরা মনে করি, মাঠ পর্যায়ের সঠিক তথ্য-উপাত্ত শ্রমখাত নিয়ে সঠিক নীতিমালা তৈরি এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে নীতিনির্ধারকদের সাহায্য করবে এবং জনসাধারণের জন্য সেসব যথাযথ মতামত গঠনে সহায়ক হতে পারে।

এটা ইতোমধ্যে স্পষ্ট যে, শ্রমখাতে ২০২০ সালে আমরা আবার প্রায় শূন্যাবস্থায় ফিরে গেছি। অর্থাৎ নতুন করে আমাদের আবার একদিকে বিপুল দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের চেষ্টা করতে হবে তেমনি বেকারি থেকে বাঁচতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর কথা বলতে হচ্ছে।

মহামারি কর্মচ্যুতি বাড়িয়েছে। যারা কাজ হারায়নি তাদেরও অনেকের মজুরি কমেছে। যারা নিজে নিজের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছেন তাদের আয় কমেছে। এসবের কারণে শ্রমজীবী-কর্মজীবীদের দরকষাকষির সুযোগ মারাত্মকভাবে কমে গেছে। এই অবস্থায় শ্রম আইন লঙ্ঘন বা অবজ্ঞা করার হারও বেড়েছে। এই অবস্থা সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন চেষ্টার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। জনকল্যাণমূলক অর্থনীতির জন্য এই মুহূর্তটি ক্ষতিকর হচ্ছে। আজকে শ্রমিকদের যদি দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়া হয় তাহলে সেটা সরকারের দারিদ্র্য নির্মূল কর্মসূচিকেই ব্যর্থ করে দেয়ার প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়।

রূঢ় বাস্তবতার মাঝেও শ্রমিক সংগঠকরা ধৈর্য ধরে ২০২০ সাল পালন করেছেন। এ বছর শ্রমিক অঙ্গনে পাটখাত এবং তাজরীন গার্মেন্টেসের ক্ষতিপূরণের বিষয় ছাড়া আর কোন খাতে আন্দোলন-সংগ্রাম তেমন হয়নি। কিন্তু সকল খাতে শ্রমিকদের পিঠ দেয়ালে ঠেকেই আছে। তৈরি পোশাক খাতে অনেক ছাঁটাইয়ের পরও শ্রমিক সংগঠনগুলোর দিক থেকে দাবি দাওয়া আদায়ে বড় কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। চা খাতে ১২০ টাকা দৈনিক মজুরিই মেনে নিয়েছে শ্রমিকরা। চামড়া খাতেও ছাঁটাই নির্বিঘ্নে অব্যাহত ছিল। কিন্তু শ্রমিক অঙ্গনের এই অবস্থা জাতীয় আর্থ-সামাজিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো লক্ষণ নয়। শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ। তাদের বিপন্নতা কিন্তু জাতীয় বিপন্নতা। এক দেশে এক গোষ্ঠীকে অন্যগোষ্ঠী নিরবে বঞ্চিত করে যাবে বা বঞ্চিতরা যুগের পর যুগ সেটা মেনে নিবে এটা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও উন্নত সমাজ গঠনের জন্য সহায়ক নয়। কাম্যও নয়।

আমরা সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি চাইছি শ্রমখাতে রাষ্ট্রস্বীকৃত ত্রিপক্ষীয়তা কার্যকর হোক। সরকার মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা মিলিতভাবে বসে শ্রমিককদের জন্য একটা শোভন কাজের পরিবেশ গঠন করবেন এবং শ্রমিকরা জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে চলবে– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এটাই অর্থনীতির বিকাশের পথ।

শোভন কাজের পরিবেশের স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রম আইনের আরও সংস্কারের কথা বলি আমরা। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা এও বলি, আইনে এখন যতটুকু অধিকার আছে সেটুকু যেন শ্রমিকরা পায় সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে সরকারের ও মালিকদের। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া এই দেশটিকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব রয়েছে শ্রমিক-মালিক-সরকার সকলের। করোনার সুযোগে দরকষাকষির সুযোগ হারানো শ্রমজীবীদের ইচ্ছামতো শোষণ করাকে তাই আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী মনে করছি।

বাংলাদেশ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে আছে– এটা যেমন একটা বাস্তবতা, তেমনিও এটাও ভুলে যাওয়ার উপায় নেই, দেশটা পুরো জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছে শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নয়। বিদ্যমান শ্রম আইনের ব্যত্যয় কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। পাশাপাশি সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি অসফল হয় এমন কোন আচরণও কোন মহল থেকে কাম্য হতে পারে না। করোনাকালে মালিকরা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় কোন আপোষ করবেন না বলেই আমরা আশা করছি। একই বিষয়ে সরকারের বাড়তি তদারকিও চাইছি। কারণ এটা শ্রমখাতে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া দুর্যোগে শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম মন্ত্রণালয়ের আরো সহায়তামূলক কর্মসূচি দরকার বলেও আমাদের বিশ্বাস। দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে শ্রমিকদের মহামারির বিপন্নতায় টিকিয়ে রাখতে হলে এমুহূর্তে কল্যাণমূলক কিছু বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ সময়ের জরুরি দাবি।

শ্রমখাত ২০২০: প্রবণতাগুলো ছিল খারাপ

২০২০ সাল ছিল বাংলাদেশের শ্রমজীবী-কর্মজীবীদের জন্য এক দুঃসহ বছর। মহামারির ছোবলে শ্রমজীবীরা পূর্বের নাজুক জীবন থেকে আরও বাড়তি নাজুকতায় ছিটকে পড়েছেন। অসুস্থতার ভয়, বেকার ও অর্থ সংকটের মিলিত আক্রমণে ছিন্নভিন্ন এক অবস্থায় দেশের লাখ লাখ শ্রমিক পরিবার।

করোনায় বিপর্যয়ের শুরু

মার্চ থেকে দেশে করোনার আঘাত শুরু হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, সিঙ্গাপুরসহ প্রবাসী বাংলাদেশী অধ্যুষিত অনেক দেশেও একই সময়ে মহামারি ভয়াবহ ছোবল হানে। ফলে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ ঘরে বাইরে দুই দিক থেকে আক্রান্ত হয়। দেশের শ্রমজীবীরা যেমন বিপদে পড়েন তেমনি যারা বিদেশে কাজ করছিলেন তারাও মুশকিলে পড়েন। ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাবে বিশ্বের প্রায় ২১টি দেশে করোনায় ১ হাজার ৯৭২ জন বাংলাদেশী মারা গেছেন। অনেক দেশে মৃতদের মাঝে বাংলাদেশের মানুষের অংশ বেশ বড়। যেমন, নভেম্বর মাসে এই লেখা তৈরির সময় দেখা যায় সৌদি আরবে করোনায় মৃত ৫ হাজার ২৯৬ জনের মধ্যে বাংলাদেশীই ৮৫০ জন।

অন্যদিকে বাংলাদেশে একই সঙ্গে মৃতের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার ছিল। এর মাঝে শ্রমজীবীদের অংশ কত সে সম্পর্কে বিশেষায়িত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বাংলাদেশে মৃতদের মধ্যে শ্রমজীবীদের অংশই অধিক বলে অনুমান করা হয়। কারণ মহামারির মুখেও রুজি রোজগারের জন্য তাদেরই ঝুঁকি নিয়ে ঘর থেকে অধিক বের হতে হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে।

এদিকে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং আইসিডিডিআরবি'র যে যৌথ গবেষণা ফল অক্টোবরে প্রকাশ করা হয় তাতে দেখা গেছে, ঢাকা শহরের বস্তির প্রায় তিন চতুর্থাংশ মানুষ ইতিমধ্যে সংক্রমিত হয়েছেন। এই গবেষণা থেকে শ্রমজীবী পরিবারগুলোতে করোনার ক্ষয়ক্ষতির কিছু স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দুর্বল ও বাণিজ্যমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় করোনাকালে শ্রমিকসহ আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে 'পিছিয়ে থাকা' জনগোষ্ঠী চিকিৎসায় চরম দুর্ভোগে পড়েছে। এসময় করোনা ব্যতীত অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসায়ও স্বাভাবিক সেবা পাওয়া দুরূহ হয়ে গিয়েছিল দেশে। যে অবস্থা এখনো খুব বেশি বদলায় নি।

বেকারত্ব বেড়েছিল এক পর্যায়ে ১০ গুণ বেশি

করোনাছোবলের সবচেয়ে বড় শিকার ছিল মানুষের 'কাজ'। লাখ লাখ মানুষকে বেকার করেছে মহামারি। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গৃহশ্রমিক থেকে শুরু করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কর্মচারী– কাউকে কর্মচ্যুত করার সুযোগ হাতছাড়া করেনি

মালিকসমাজ। কমবেশি সব খাতে বিপুল মানুষ মার্চ থেকে ধারাবাহিকভাবে কাজ হারাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় ছোবল পড়েছে গৃহশ্রমিকদের মাঝে। করোনার শুরুতে তাৎক্ষণিকভাবে লাখ লাখ গৃহশ্রমিকের জন্য কর্মস্থলের দরোজা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে অচ্ছ্যুতের মতো আচরণ করা হয়।

অন্যদিকে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে মালিকরা কারখানা বন্ধের অজুহাতে অনেকের বেতন কমিয়ে দেন, বেতন দেয়া বন্ধ করে দেন কিংবা চাকুরি থেকেই অনেককে বাদ দেন। বৃহৎ শিল্পেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের এক জরিপে দেখা গেছে পোশাক খাতের ৯১ ভাগ শ্রমিক বলেছেন, করোনার শুরুতে তারা পুরো বেতন পাননি। করোনাকালীন অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশে শ্রমিকদের জন্য অধিকতর আইনগত সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা চোখে পড়েছে।

নতুন করে বিপুল মানুষ দরিদ্র হয়ে গেলেন

করোনায় দারিদ্র্যও ব্যাপক বেড়েছে। কত বেড়েছে সেটা নিয়ে বছর শেষে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিলো। করোনার আগে ২০১৯-এর শেষে দেশে দারিদ্র্যের হার প্রায় ২০ ভাগে নেমে এসেছিল।

সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা কমিশনের মতে করোনায় দারিদ্র্যের হার বেড়ে ২৯ শতাংশ হয়েছে। আর পিপিআরসি ও বিআইডিএস-এর জুন মাসের এক যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে, দারিদ্র্য বেড়ে ৪৩ শতাংশ হয়েছে। আরেক গবেষণা সংস্থা সিপিডির দাবি, এ হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপে দেখা গেছে, পরিবারভিত্তিক মাসিক আয় প্রায় ৪ হাজার টাকা কমে সাড়ে ১৫ হাজার টাকা হয়েছে। এই ব্যুরো একটা রাষ্ট্রীয় সংস্থা। সংস্থাটি বলেছে, করোনায় মানুষের আয় কমেছে ২০ শতাংশ। করোনার আগে গত মার্চ মাসে প্রতি পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ১৯ হাজার ৪২৫ টাকা। আগস্টে সেটা কমে দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৪৯২ টাকায়। বিবিএস অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে এই জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী পরিবারগুলোতে আয় কমায় ভোগের চাহিদাও কমেছে। মার্চে পরিবারপ্রতি মাসিক খরচ ছিল গড়ে ১৫ হাজার ৪০৩ টাকা। আগস্ট মাসে তা কমে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ১১৯ টাকা। জরিপে অংশ নেওয়া পরিবারগুলোর মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ জানিয়েছে করোনায় কোনো না কোনোভাবে আর্থিক সমস্যায় পড়েছে তারা। অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশের বেশি পরিবার করোনাকালে জীবনধারণ করতে গিয়ে আর্থিকভাবে বিপাকে পড়েছে। একই সংস্থা তাদের জরিপে মার্চ পরবর্তী সময়ে বেকারত্ব ১০ গুণ বাড়ার কথা জানিয়েছিল। পরে সেপ্টেম্বর নাগাদ সেটা কমারও দাবি করেছে তারা।

বিবিএসের মতে মার্চ মাসে বেকারত্বের হার ছিল ২ দশমিক ৩ শতাংশ। জুলাইয়ে তা বেড়ে হয় ২২ দশমিক ৩৯ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে এসে বেকারত্বের হার নেমেছে ৪ শতাংশে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার (আইএলও) নিয়ম অনুযায়ী, কোনো চাকরি বা কাজপ্রত্যাশী যদি সপ্তাহে এক ঘণ্টা মজুরির বিনিময়ে কাজ করার সুযোগ না পান, তাহলে তাদের বেকার হিসেবে ধরা হয়। বিবিএস সেই হিসাব ধরেই বেকারত্ব সম্পর্কে উপরোক্ত তথ্যসমূহ উল্লেখ করেছে। বেকারত্বের এই সংজ্ঞাকে আরও রক্ষণশীলভাবে নিলে দেশে ২০২০ সালে বেকারত্বের বিপুলতা আঁচ করা দুঃসাধ্য নয়।

করোনার সুযোগে আর্থিকভাবে সবল ও সচ্ছল খাতগুলোও অল্প-বিস্তর কর্মী ছাঁটাই শুরু করে বা বেতন কমাতে শুরু করে। যেমন, সেসময় ব্যয় কমানোর নামে ওয়ান ব্যাংক, দ্য সিটি ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, এবি ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা কমানোর উদ্যোগ নিলে এই খাতের কর্মীদের মাঝে আতংকাবস্থা চলতে থাকে। তবে কিছু ব্যাংক বেতন-ভাতা কমানো হবে না বলেও জানায় তখন।

সামাজিক অসাম্য বেড়েছে আরেক দফা

মহামারিতে শ্রমজীবীদের মাঝে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বাড়লেও দেশে কিছু মানুষ করোনাকালেও অর্থ-বিত্তে ফুলে ফেঁপে উঠছিল। তার প্রমাণ হিসেবে দেখা গেছে, তুমুল করোনার মাঝেই দেশে কোটিপতি একাউন্ট বেড়েছে ৩ হাজার ৪১২টি। ২০২০-এর মার্চে কোটিপতি একাউন্ট ছিল ৮২ হাজার ৬২৫। তিন মাস পর জুনে সেটা দাঁড়িয়েছে ৮৬ হাজার ৩৭ জন। প্রচারমাধ্যমে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। বর্তমান সংকলণেও এ বিষয়ে একটি পৃথক লেখা আছে।

উল্লেখ্য, একটি দেশের আয়বৈষম্য পরিমাপের মানদন্ড হলো গিনি কো-এফিশিয়েন্ট। ২০০৮ সালে দেশে গিনি কো-এফিশিয়েন্ট ছিল ০.৩২ শতাংশ। ১০ বছর পর এসে তা বেড়ে ০.৪৯ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থনীতিবিদদের পরিভাষায় এটি উদ্বেগজনক। এ ধরনের উদ্বেগজনক আয়বৈষম্যের এক প্রান্তে রয়েছে শ্রমজীবীদের জীবন। দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে ২০ জুনের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭৪ সালে দেশে গিনি সহগের মান ছিল ০.২৪। ২০১০ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ০.৪৫৮। ২০১৬ সালে তা আরও বেড়ে হয়েছে ০.৪৮৩। এখন তা আরও বেড়েছে। এ পরিস্থিতির কারণে সবচেয়ে ধনী পাঁচ শতাংশ পরিবার দেশের মোট আয়ের প্রায় ২৮ শতাংশ পায়। অথচ নিচের দিকে থাকা পাঁচ শতাংশ পরিবার পায় মাত্র শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। (দৈনিক সারাবাংলা, ১৭ অক্টোবর ২০২০)

সম্পদ বৈষম্যের এসব দিকের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনা। এ বছর করোনার মাঝে মজুরি নিয়ে মনোযোগ আকর্ষণী আন্দোলন হয়েছে চা খাতে। ফলে সেখানে দৈনিক মজুরি ১০২ টাকা থেকে বেড়ে ১২০ টাকা করার অঙ্গীকার হয়েছে। যদিও সাধারণ শ্রমিকদের দাবি ছিল দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরির।

বিরাষ্ট্রীকরণের নব তরঙ্গ

২০২০ সালে আয় বৈষম্যের এই ধারাবাহিকতাকে আরও বেগবান করেছে শিল্পখাতে বিরাষ্ট্রীয়করণের নতুন উদ্যোগসমূহ। এই উদ্যোগের বড় দৃষ্টান্ত ছিল পাটকল খাতে এক যোগে প্রায় ২৫টি কারখানা বন্ধ করে দেয়া। এছাড়া চিনিকলগুলো থেকে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহারেরও শঙ্কা চলছিল বছরের শেষ দিকে।

পাটকলগুলো বন্ধ করায় তাৎক্ষণিকভাবে ২০ থেকে ২৫ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যায়। এছাড়া পাটের উৎপাদন ও বিপননের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ এতে কর্মহীন হওয়ার শংকা রয়েছে। সরকার মূলত অব্যাহত লোকসানকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে বিরাষ্ট্রীকরণের এসব উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা হলো কারখানাগুলো বন্ধের দু'মাস পরও সকল শ্রমিক তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতা পাচ্ছিলো না এবং তার ফলে খুলনাসহ বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে অসন্তোষ বিরাজ করছিল। তবে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন (ডেইলি স্টার ১ অক্টোবর), চিনিকল বন্ধ কিংবা শ্রমিক ছাঁটাই করা হবে না। বরং, চিনিকলগুলোকে আধুনিকায়ন ও বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে এগুলোকে লাভজনক করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বছর শেষে তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তব অবস্থায় অসঙ্গতি দেখা দেয়।

২০২০ সালের উপরোক্ত শ্রম-প্রবণতাগুলো নিয়ে বর্তমান সংকলনে পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত তথ্য উপাত্তভিত্তিক প্রতিবেদন রয়েছে। এসব প্রতিবেদনের মাধ্যমে বছরজুড়ে শ্রমজীবী মানুষ কীভাবে ৩৬৫ দিন অতিক্রম করেছে তার একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

-

তাজরীণ পোশাক তৈরি কারখানায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের আন্দোলন ও উচ্ছেদ

২০২০ সালে শ্রমিক অঙ্গনে একটা মনোযোগ আকর্ষণী আন্দোলন গড়ে তোলে তাজরীন গার্মেন্টেস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা। আট বছর আগে দেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল ১১৭ জন শ্রমিক। আহত হয় প্রায় দুই শতাধিক। আহতদের বেশির ভাগ শারীরিকভাবে অনেকটাই অক্ষম এখন। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মালিকের শাস্তি এবং আহতদের আইনসম্মত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ২০২০-এর আগস্ট থেকে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে স্থায়ীভাবে এক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। এসময় ঐ দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকরা জানায়, আটবছর পরও তারা নিয়মমতো ক্ষতিপূরণ পায়নি। এছাড়া এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ীদেরও আট বছর পরও কেন কোন শাস্তি হলো না সেই প্রশ্নও তুলছিল তারা।

মাত্র ২৫ জন শ্রমিক প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলন গড়ে তুললেও পরে দেশের নাগরিক সমাজের অনেক মানুষও এই আন্দোলনে শামিল হয়। আন্দোলনের আয়োজক শ্রমিকদের প্রায় সবাই কোন না কোনভাবে আট বছর আগের দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। তারা আন্দোলনের দিনগুলোতে প্রতিদিনই গত আট বছরের চিকিৎসা সংকটের কথাও জানাচ্ছিলেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে থাকা তাজরীন ফ্যাশনের পাঁচতলার সুইং অপারেটর জরিনা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'আমি আজকে পঙ্গু জীবনযাপন করছি। আমার দেশের বাড়িতে ঘর নাই। পরিবার নিয়ে যেন চলতে পারি সেই মোতাবেক আমাদের ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে এটাই আমাদের এই আন্দোলনের মূল দাবি।

উল্লেখ্য, ওই ঘটনায় বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩২৩, ৩২৫, ৩৩৬, ৩০৪-এর-ক ও ৩৪ ধারায় ২৫ নভেম্বর আশুলিয়া থানায় বাদী হয়ে মামলা করেন উপপরিদর্শক (এসআই) খায়রুল ইসলাম। পরে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) পরিদর্শক এ কে এম মহসিনুজ্জামান খান ২০১৩ সালের ২২ ডিসেম্বর ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) আদালতে তাজরীন ফ্যাশনের এমডি দেলোয়ারসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। চার্জশিটভুক্ত বাকি আসামিরা হলেন, তাজরীন ফ্যাশনের চেয়ারম্যান মাহমুদা আকতার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা দুলাল, স্টোর ইনচার্জ হামিদুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, সিকিউরিটি গার্ড রানা ওরফে আনারুল, সিকিউরিটি সুপারভাইজার আল-আমিন, স্টোর ইনচার্জ আল-আমিন ও লোডার শামীম মিয়া। এদিকে ডিসেম্বরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়া হয়।

জাতীয় বাজেট

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ সবচেয়ে কম

চরম আতংকজনক এক সময়ে ২০২০ সালের বাজেট ঘোষিত হয়েছিল। ১১ জুন ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় ধরে জাতীয় বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

বাজেটে আয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। আয়-ব্যয়ের ব্যবধান হিসেবে ঘাটতি ধরা হয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা।

মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ সবচেয়ে কম!

২০২০-২১ সালের বাজেট অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দের মাঝে সবচেয়ে কম বরাদ্দ পেয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পায়। যা ২০১৯-২০ এর সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ থেকেও কম। ২০১৯-২০ এ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৬৭ কোটি টাকা।

অন্যদিকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ সালের বাজেটে বরাদ্দ পেয়েছে ৬৪২ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এই মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫৯১ কোটি টাকা।

এবারের বাজেটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য সর্বমোট বরাদ্দ দেখা গেছে ৫,৬৮,০০০ কোটি টাকা। এর মাঝে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের হিস্যা হিসেবে দেখা গেছে দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ (.০৬%)। আর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের হিস্যা হলো দশমিক ১১ শতাংশ (.১১%)। শ্রম এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে বরাদ্দ পেয়েছে দশমিক ১৭ শতাংশ (.১৭%)। অর্থাৎ শ্রম ও প্রবাসীরা যৌথভাবে জাতীয় বরাদ্দের এক ভাগ বরাদ্দও পাচ্ছে না। অথচ এই দুই মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দেশে কাজ করা শ্রমিক এবং বিদেশে কাজ করা শ্রমজীবী-কর্মজীবীরা মিলে দেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে!

তিন বছরের ব্যবধানেও শ্রম খাতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ স্থির

বছরওয়ারী তুলনামূলক এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৭-১৮ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দ ছিল ২৬৮ কোটি টাকা। একই বছরে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬৮৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ শ্রম সংক্রান্ত এই দুই মন্ত্রণালয় মিলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ পায়। ৯৫৬ কোটি টাকা। আর তিন বছর পর ২০২০-২১ এ এই দুই মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে পেয়েছে ৯৯২ কোটি টাকা। তিন বছরে

এই দুই মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দে বৃদ্ধির হার তিন-চার শতাংশ মাত্র। অথচ একই সময়ের ব্যবধানে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে আরও অনেক বেশি হারে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য সম্মিলিত বরাদ্দ ছিল ৫ লাখ ৩৫ হাজার ২১৪ কোটি টাকা। শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ঐ বরাদ্দের দশমিক ১৭ শতাংশ (.১৭%) পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জাতীয়ভাবে তিন অর্থ বছরের ব্যবধানে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দের হিস্যা একই রয়ে গেছে। অথচ একই সময়ে মোট বাজেট বরাদ্দের আয়তন স্পষ্টত অনেক বেড়েছে।

একই সময়ে বাজেট বরাদ্দে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মন্ত্রণালয়গুলোরও বরাদ্দ বেড়েছে। যেমন, সংস্কৃতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয় সচরাচর বাজেটে কম বরাদ্দ পাওয়া দুটো মন্ত্রণালয়। ২০১৭-১৮ সালে এই দুই মন্ত্রণালয় বরাদ্দ পেয়েছিল যথাক্রমে ৪১৭ ও ৬৫৮ কোটি টাকা। আর ২০২০-২১ এ এই দুই মন্ত্রণালয় বরাদ্দ পেল যথাক্রমে ৫৭৯ ও ১ হাজার ৬৯৩ কোটি টাকা।

চৌদ্দ লাখ শ্রমজীবীর কর্মসংস্থানহীন হওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল বাজেটে

২০২০ সাল ছিল মহামারি শুরুর বছর। মহামারির রেশ এখনও অব্যাহত আছে। এ সময় দেশে সবচেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে শ্রমজীবীরা। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে দেশে প্রায় ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ লোক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। এই সুবিশাল জনগোষ্ঠি দেশকে সচল রাখার মূল শক্তি। কিন্তু কোভিড এদের অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনকে নাজুক করে দিয়ে গেছে। এ অবস্থায় এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় মদদ।

এ বছরের বাজেটে তার প্রতিফলন থাকলেও সেটা ছিল মৃদু। বাজেট বর্ক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মহোদয় নিজেই এডিবির অনুমান উল্লেখ করে ১৪ লাখ শ্রমজীবীর কর্মসংস্থান হারানোর অনুমানের

কথা জানিয়েছিলেন। এই কর্মসংস্থান হারানো মানুষদের জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন প্রকল্প তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। তবে কিছু 'প্রণোদনা প্যাকেজে'র উল্লেখ ছিল বাজেটে। এসব প্যাকেজের মধ্যে ছিল ৫০ হাজার কোটি টাকার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ, ৫০ লাখ পরিবারকে আড়াই হাজার টাকা করে প্রদান, কর্মহীনদের মাঝে চার লাখ টন চাল এবং এক লাখ টন গম প্রদান এবং কৃষিখাতে ভর্তুকি বৃদ্ধির ঘোষণা ইত্যাদি। এসব প্যাকেজে অবশ্যই কিছু মানুষ উপকৃত হয়েছে এবং সেই সূত্রে কোভিডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের আর্থ-সামাজিক সংকট কিছু লাঘব হবে। কিন্তু বাজেটে শ্রমজীবীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন প্রকল্প থাকার বিষয়টি অধরাই থেকে যায়। সুবিধাজনক শর্তে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত কোন শর্তকে ঋণ পাওয়ার শর্ত হিসেবে যুক্ত করা হবে কি না– সে বিষয়ে কোন নির্দেশনা মিলেনি। আবার, কেবল কর্মসংস্থান হারানোর পুনর্বাসনই নয়– শ্রমজীবীদের স্বাস্থ্যপ্রশ্নও করোনাকালে বড় এক জাতীয় উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে। বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ বাড়লেও তা থেকে শ্রমজীবীরা পৃথকভাবে কীভাবে উপকৃত হবে তার কোন বিবরণও দেয়া হয়নি বাজেটে।

-

সারণী-১: তিন বছরের ব্যবধানে শ্রমখাতের দুটি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের চিত্র

সাল	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	উভয় মন্ত্রণালয় মিলে প্রাপ্ত বরাদ্দ	সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বরাদ্দের অংশ	মোট বরাদ্দে হিস্যা
২০২০-২১	৩৫০ কোটি টাকা	৬৪২ কোটি টাকা	৯৯২ কোটি টাকা	৫৬,৮০০০কোটি টাকা	.১৭%
২০১৭-১৮	২৬৮ কোটি টাকা	৬৮৮ কোটি টাকা	৯৫৬ কোটি টাকা	৫৩,৫২১৪ কোটি টাকা	.১৭%

বাজেট: জনতার যা প্রত্যাশা ছিল

বাজেটকালে জনতার প্রত্যাশা কী থাকে এ বিষয়ে ২০২০-২১ বাজেটকালে 'গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন' একটা জরিপ পরিচালনা করেছিল। মহামারির সময় শারীরিক দূরত্বের নীতিকে মেনে নিয়ে মূলত মোবাইল ফোনকে ব্যবহার করে এই জপির পরিচালিত হয়। এতে আটটি প্রশাসনিক বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার ৪১১ জনের মতামত সংগৃহীত হয়। উত্তরদাতাদের ৩১ শতাংশ ছিলেন নারী। তাতে নিম্নরূপ প্রত্যাশা ও মতামতের কথা জানা যায়।

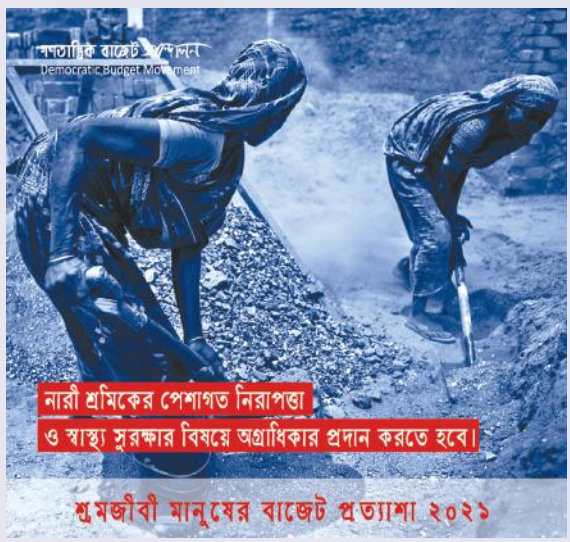

[এক] ৩৩.৯ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন বাজেটে তাদের প্রত্যাশার প্রতিফলন থাকে না। ৯.৫ ভাগ বলেছেন, থাকে। আর ৫৪.৬ শতাংশ বলেছেন 'মোটামুটি' প্রতিফলন থাকার কথা।

[দুই] উত্তরদাতাদের মতে, বাজেটে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীরা। ৬৫.৪ ভাগ উত্তরদাতা তাদের অভিমতে কৃষিখাতের উপেক্ষার কথা বলেছেন; এবং ৬১.৭ ভাগ উত্তরদাতা শ্রমখাতের উপেক্ষার কথাও যুক্ত করেছেন তাদের অভিমতে।

[তিন] বাজেট প্রণয়নে প্রাক-বাজেট আলোচনায় আসা মতামতের কোন প্রতিফলন কী থাকে? ৬৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, খুব সামান্যই এরকম মতামতের প্রতিফলন ঘটে মূল বাজেটে; এমনকি অনেক সময় কোনই প্রতিফলন থাকে না। ৫.৫ ভাগ 'প্রতিফলন থাকে' বলে অভিমত দিয়েছেন। মোটামুটি প্রতিফলন থাকার কথা জানিয়েছেন ১৬ ভাগ উত্তরদাতা।

[চার] ৮০ ভাগ উত্তরদাতা চাইছেন বাজেট হোক জেলাভিত্তিক চাহিদার আলোকে।

[পাঁচ] ৭৮ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন, নারী উন্নয়নে পৃথক বাজেট থাকা উচিত।

[ছয়] বাজেটে কৃষি ও স্বাস্থ্য সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন উত্তরদাতারা।

[সাত] বাজেটে শ্রমজীবীদের জন্য কোন খাতে বরাদ্দ বেশি প্রয়োজন? এ প্রশ্নের উত্তরে ৭৩ ভাগ উত্তরদাতা শিশুখাদ্যসহ রেশনের কথা জানিয়েছেন।

[আট] কৃষিখাতের বরাদ্দে সর্বাগ্রে থাকা উচিত প্রান্তিক কৃষকদের কৃষিভর্তুকির অর্থ সরাসরি ঐ কৃষকের মোবাইলে দেয়া।

[নয়] অসচ্ছল পরিবার থেকে অন্তত একজনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাও উপরোক্ত মতামত সংগ্রহে অনেকের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটা চাওয়া ছিল।

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলনের পক্ষ থেকে শ্রমজীবীদের জন্য দাবিনামা

১. সকল শ্রমজীবী পরিববারকে মহামারি সামলাতে ১ বছর খাদ্য সহায়তা প্রদান করতে হবে; এজন্য শিশু-খাদ্যের সুবিধাসহ রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

২. অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত আড়াই কোটি দরিদ্র শ্রমিক পরিবারকে ৬ মাস মাসে আট হাজার টাকা বেসিক ইনকাম গ্রান্ট প্রদান করতে হবে।

৩. অবিলম্বে শ্রম আইনের ১২, ১৬, ২০, ২৬ ধারা স্থগিত ঘোষণা করতে হবে যাতে কারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, লে-অফ ঘোষণা থেকে মালিকগণ বিরত থাকেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তিখাত ও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প-কারখানায় কোন প্রকার শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই চলবে না। লকডাউনকালের জন্য অন্তত ৩ মাস পূর্ণ বেতন দিতে হবে।

৪. কোভিড পরিস্থিতিতে কর্মস্থলে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ছাড়া কাউকে কাজে যোগ দেয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কোভিডকালীন কাজে যোগ দেয়া সকল শ্রমিক-কর্মচারীকে ঝুঁকি ভাতা প্রদান করতে হবে।

৫. যেকোন শ্রমিকের করোনা লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র কোভিডজনিত পরীক্ষা, উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ও আনুসঙ্গিক সুবিধা ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। সকল শ্রমিককে স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনতে হবে।

৬. কোভিডে কাজে যোগ দেয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের ও তার পরিবারের দায়িত্ব মালিককে নিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৭. সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে; এ লক্ষ্যে পেশাজীবী শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও শ্রমজীবী নিবন্ধন করে পেনশন স্কীম চালু করতে হবে। এজন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

৮. শ্রমজীবীদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে সরকারকর্তৃক শ্রমিক বন্ড চালু করার ব্যবস্থা নিতে পারে। সামাজিক বীমার প্রচলন করতে হবে।

৯. নারী শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১০. রপ্তানিমুখী শিল্প-শ্রমিকের বেতন পরিশোধের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সরকারি প্রণোদনা/ঋণ-সহায়তা সরাসরি প্রকৃত উপকারভোগী তথা শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. শ্রমজীবীর জন্য বিশেষ হাসপাতাল চালু করতে হবে।

১২. ফিরে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভান্ডার তৈরি, পুনরায় বিদেশ প্রেরণে সহায়তা অথবা পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদানের জন্য কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ।

১৩. কৃষি শ্রমিক, কৃষিতে স্ব-নিয়োজিত বর্গাচাষীদের জন্য উপকরণ সহায়তা, উৎপাদিত পণ্যে নগদ ভর্তুকি প্রদানসহ কৃষিপণ্যের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ দেয়া।

১৪. শিল্পাঞ্চলগুলোতে শ্রমিকদের বসত এলাকাকে শিল্পশ্রমিক আবাসন এলাকা ঘোষণা করে তাদের বাড়ীভাড়া রেট নির্ধারণ ও তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ীওয়ালাদের হোল্ডিং ট্যাক্স মাফ করে দিতে হবে। যাতে শ্রমিকেরা স্বল্প ব্যয়ে ভাড়ায় থাকতে পারে।

আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে দাবি

ক্রেতা ও ব্রান্ডকর্তৃক করোনাকালীন কোন কার্যাদেশ বাতিল করা যাবে না। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় কল্যাণমূলক ব্যয় বাড়াতে হবে। কেন্দ্রীয় তহবিলে ক্রেতাকর্তৃক অনুদান প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

গুটিয়ে গেল রাষ্ট্রীয় পাটশিল্প

২০২০ সালে বাংলাদেশের শিল্পখাতের সবচেয়ে বড় খারাপ খবর ছিল পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া। রাষ্ট্রায়ত্ত এসব পাটকল পরিচালিত হতো বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) অধীনে। সরকার এসব পাটকল বন্ধের কারণ হিসেবে লোকসানের কথা জানায়। এই ঘোষণার সময় দেশে সরকার পরিচালিত ২৫টি পাটকলে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক ছিলেন। আবার শিল্পাঞ্চলে এসব শ্রমিক জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে দশকের পর দশকে অনেক অ-শ্রমিক নানান অর্থনৈতিক কার্যক্রম গড়ে তুলেছিলেন। সেসবও এই ঘোষণায় বন্ধ হয়ে গেল। কলোনি ছাড়তে যেয়ে অনেক শ্রমিক গৃহহীনও হয়।

উল্লেখ্য, পরিচালনাগত অদক্ষতার কারণে দীর্ঘদিন থেকে শোনা যাচ্ছিলো, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো লোকসান গুনছে। শ্রমিকদের অনেক সময়ই আন্দোলন করে বেতন আদায় করতে হতো। সরকার বলতো তারা এই খাতে ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন পাটকলগুলো আধুনিকায়ন করা হচ্ছে না, কেন বেসরকারি খাতের পাটকল লাভজনক থাকার পরও সরকারি খাতেরগুলো লোকসান দিচ্ছে সে বিষয়টি বরাবরই অজ্ঞাত থেকে যায়। জুনে যখন পাটকল বন্ধের কথা জানানো হয় তখনো ইতোপূর্বে অবসরে যাওয়া হাজার হাজার শ্রমিকের পাওনা বাকি ছিল।

বন্ধের ঘোষণার সময় বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, নয় হাজার কর্মী আছেন, যারা পেনশনের টাকা পাননি। তাদের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রথম কিস্তির টাকা দেয়া হবে। এই কর্মসূচির নাম দেয়া হয়েছে 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক'।

তিনি বলেন, 'আগে মিলগুলোকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। আমরা বিক্রি না করে জুট মিল রাখব। এমন ম্যানেজমেন্ট দেব যাতে লোক ছাঁটাই না হয়। এ শ্রমিকরা এখানেই চাকরি পাবেন, কারণ দক্ষ কর্মী ছাড়া মিল চালাতে দেয়া হবে না। মিলগুলো বুঝে পাওয়ার পর টেন্ডার হবে। যে বেশি দেয় তাকে দেয়া হবে। কিন্তু তাকে অবশ্যই পাটকল পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। দক্ষ না হলে সে কাজ করবে না। জমি নেয়ার চেষ্টা করলে সেটা আমরা দেব না। পিপিপির মাধ্যমে জুট মিল থাকবে, এটা ডিসাইডেড।'

তবে বছর শেষে প্রচারমাধ্যমে বারবার এরকম সংবাদ প্রচারিত হচ্ছিলো যে, বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল দ্রুত উৎপাদনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এখনও কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। সরেজমিন পাটকলগুলো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হলেও বড় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি। সরকার চাইছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) পদ্ধতিতে এগুলো আবার চালু করতে। কিন্তু উদ্যোক্তারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনার অধীনে ১০০ বছরের জন্য ইজারা আকারে চান।

এদিকে ঢাকায় বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেছেন– বন্ধ না করে উন্নত প্রযুক্তির আধুনিক মেশিন সংযোজন করে পাটকল চালু রাখা যেত। উন্নত প্রযুক্তি সংযোজন করে পাটকলগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা সম্ভব ছিল। তাদের মতে, পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। এটা মাথা ব্যথার কারণে মাথা কেটে দেওয়ার শামিল। শ্রমিক নেতারা বলেন, বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় যখন পাটপণ্যের স্বীকৃতি বাড়ছে, তখন দেশের পাটকল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। তাঁরা আরও বলেন, 'অদক্ষ আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে এই সেক্টর পরিচালিত হয়েছে– যারা পাট ক্রয়ে দুর্নীতি, উচ্চমূল্যে নিম্নমানের পাট ক্রয়, মওসুমে সময়মতো পাট সরবরাহ না করা এবং উৎপাদিত পাটপণ্য বিপণনে কোনও কার্যকর ভূমিকা রাখেনি–তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে এখন তাদেরই প্রস্তাবনায় বিদ্যমান পাটকলগুলো বন্ধ করে শ্রমিকদের কর্মহীন করা অমানবিক ও অন্যায়।'

এদিকে ২০১৯ এর এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় দেশে বেসরকারি খাতের জুট স্পিনিং মিলসহ প্রায় ২২২টি পাট পণ্যের কারখানা আছে এবং সবগুলোই ভালো চলছে। ২০১৯-এর জুলাই-ডিসেম্বরেও পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি পূর্বের চেয়ে প্রায় ২২ ভাগ বেড়েছে। এমনকি তা রফতানি লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি হয়েছে। এর পূর্ববর্তী বছরের জুলাই-ডিসেম্বরে এই পণ্য থেকে রফতানি আয় হয়েছে ৪২১ মিলিয়ন ডলার। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর সূত্রে এসব তথ্য মিলেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রফতানি করে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮২৪ মিলিয়ন ডলার।

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন ও পরিত্যক্ত পাটকলসহ সাবেক ইপিআইডিসির ৬৭টি পাটকল তদারক, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিজেএমসি গঠিত হয়েছিল। পরে আরও পাটকল সরকারি করে বিজেএমসির আওতায় আনা হয় মোট ৮২টি পাটকল। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ৪৩টি পাটকল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার পর সরকারের হাতে থাকে বাকিগুলো। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে পাটখাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় আরও ১১টি পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এশিয়ার বৃহত্তম আদমজী জুট মিল বন্ধ হয়ে যায় বিএনপি সরকারের আমলে, ২০০২ সালে। এরপর সরকারের হাতে থাকা বাকি পাটকলগুলোও সর্বশেষ ২০২০ সালে গুটিয়ে ফেলা হলো। ফলে পুরো খাত বেসরকারি মালিকদের হাতে চলে গেল।

চিনিকলও বন্ধ হচ্ছে?

পাটকলের পর বছর শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোর কার্যক্রমও গুটিয়ে ফেলার খবর প্রকাশিত হয় বছরের শেষ দিকে। এতে এই খাতেও কর্মসংস্থানের বিরাট বিপর্যয় তৈরি হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়। দৈনিক দেশরূপান্তরের ৩ ডিসেম্বরের এক সংবাদ থেকে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে দেশের চিনিকলগুলোর মাঝে ৬টিতে এবার আখ মাড়াই হবে না। আখমাড়াই স্থগিত হওয়া চিনিকলগুলোর মধ্যে রয়েছে পাবনা সুগার মিল, কুষ্টিয়া সুগার মিল, পঞ্চগড় সুগার মিল, শ্যামপুর সুগার মিল, রংপুর সুগার মিল ও সেতাবগঞ্জ সুগার মিল।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলে প্রায় ১৬ হাজার মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছিল। আবার পাঁচ লাখ চাষিও আখচাষের সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়া পরোক্ষভাবে ৫০ লাখ মানুষের জীবিকা আবর্তিত হয় আখচাষকে কেন্দ্র করে। চিনিকল এলাকায় গেলে দেখা যায় চিনিশিল্পকে কেন্দ্র করে আশপাশের জনপদে গড়ে উঠেছে রাস্তাঘাট, ব্যাংক, হাটবাজার, অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ছাড়াও বিদ্যুৎ অবকাঠামো, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থাপনা।

এ ছাড়া চিনির উপজাত (চিটাগুড়, ছোবড়া ইত্যাদি) কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে আরও অনেক শিল্প ও কর্মসংস্থান। যেমন কাগজ, অ্যালকোহল, জৈব সার, স্যানিটাইজার ইত্যাদি। আখের ছোবড়া ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তা দিয়ে মাড়াই মৌসুমে চিনিকলগুলো অনায়াসে চলতে পারে। এই চিনিকলগুলো কর্মসংস্থান তৈরির বাইরেও প্রতিবছর সরকারি কোষাগারে এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকার বেশি কর হিসেবে দিয়েছে। এসব কারখানা বন্ধ না করে– নতুন করে বিনিয়োগ করে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংস্কার করা হলে এগুলোর অর্থনৈতিক অবদান বহুগুণ বৃদ্ধি পেত বলে উল্লেখ করেছেন এ বিষয়ক এক লেখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা গত ৩ ডিসেম্বর।

উল্লেখ্য, পাটকল বন্ধের সময় নীতিনির্ধারকদের তরফ থেকে এমন শঙ্কাকে নাকচ করে দেয়া হয়েছিল যে, চিনিকলগুলো মোটেই বন্ধ করা হবে না।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে জানা গেছে, স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে রফতানি আয়ের ৯০ শতাংশই ছিল পাটের অবদান। এরপর ক্রমে সেই হিস্যা কেবল কমেছে। বাড়েনি।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই পাটশিল্পের পুনরুত্থান ঘটানোর অঙ্গীকার করেছিল। সেই সময়ের নির্বাচনী ইশতেহারে পাটশিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা বিজেএমসির পেছনে ব্যয় করেছিল পাট খাত চাঙা করার জন্য। বেসরকারি খাতে থাকা কয়েকটি কারখানা আবার ফিরিয়েও আনা হয়েছিল। কিন্তু ২০২০ এর সিদ্ধান্ত দেখালো বিষয়টি নিয়ে টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সংকট ছিল। ফলে আবার উল্টো কর্মসূচি নিতে হলো।

সারণী-২: পাটকল বিরাষ্ট্রীয়করণের ধারাবাহিকতা	
১৯৭২ সাল	বিজেএমসি গঠন এবং ধীরে ধীরে ৮২টি পাটকলের মালিকানা গ্রহণ
১৯৭৭-৯৬ সাল	৪৩টি পাটকল বেসরকারি খাতে হস্তান্তর
১৯৯৩ সাল	১১টি পাটকল বন্ধ ঘোষণা
২০০২ সাল	বৃহত্তম পাটকল 'আদমজি' বন্ধ ঘোষণা
২০২০ সাল	২৫টি পাটকল বন্ধ ঘোষণা

সাক্ষাৎকার

'পাওনা বাকি, অথচ কলোনি থেকে শ্রমিকদের চলে যেতে বলা হচ্ছে'

– রুহুল আমিন, সংগঠক, ছাত্র-শ্রমিক-জনতা ঐক্য, খুলনা; তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়েছে ২৫ আগস্ট। এই সংগঠন পাটকলগুলো পুনরায় চালু এবং শ্রমিকদের বকেয়া দেয়ার দাবি জানাচ্ছিল। রুহুল আমিন এই আন্দোলনের কারণে একবার গ্রেফতারবরণ করেছিলেন।

বর্তমানে পাটকলগুলোর কী অবস্থা?

কারখানা পর্যায়ে সব উৎপাদন বন্ধ। তবে কারখানাগুলোর দপ্তর পর্যায়ে অফিসিয়াল কাজকর্ম হচ্ছে।

তার মানে অফিসগুলো থাকছে? কেবল শ্রমিকরা কর্মহীন?

পাটকল কর্পোরেশনের স্থানীয় কার্যালয়গুলো তো রয়েছে। হয়তো তাদের জনবল কমবে, কিন্তু কার্যালয়গুলোকে বন্ধ হতে দেখিনি। বরং সেগুলো চালু থাকার কথাই জানি।

কর্মহীন শ্রমিকরা কী এলাকায় বা কলোনিতে রয়েছে? তাদের অবস্থা কী?

আনুমানিক হিসাবে প্রায় ৫০ ভাগ শ্রমিক ইতোমধ্যে চলে গেছে। এসব শ্রমিকরা অনেকেই নোয়াখালী, বরিশাল, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের। চলে যাওয়াদের মধ্যে আছেন, বিশেষ করে যারা পরিবার দূরে রেখে একা থাকতেন তাঁরা। আর পরিবার-পরিজন নিয়ে যারা ছিলেন তাদের একাংশ এখনও এলাকায় আছেন।

শ্রমিকরা যে চলে যাচ্ছে, পাওনা সব অর্থকড়ি কী পেয়েছে তারা?

শ্রমিকদের পাওনা তো বহু ধরনের। সাপ্তাহিক মজুরি বকেয়া নেই এখন আর। কিন্তু মজুরি থেকে যে টাকা কেটে নেয়া হতো এবং যে টাকা সরকার প্রত্যেক শ্রমিকের ঐ কেটে নেয়া টাকার সঙ্গে জমা করতো এসব পাওনা তো রয়ে গেছে। আবার নতুন মজুরি কমিশনের হিসাবেও অনেক বকেয়া পাওনা শ্রমিকদের। নিয়ম হলো কারখানা বন্ধ করার ৬০ দিনের মধ্যে এরকম বকেয়া পরিশোধ করে দিতে হবে। কিন্তু আজকে সেই ৬০ দিনের ৫ দিন মাত্র বাকি আছে। কেউ ঐসব বকেয়া পেয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে না। সরকার বলেছিল, সেপ্টেম্বরে পাওনা দিয়ে দেয়া হবে।

এখন আন্দোলন হচ্ছে কী বকেয়ার দাবিতে?

আন্দোলনের প্রধান দাবি মিলগুলো চালু করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকই মিল চালুর পক্ষে। যাদের কর্মজীবন একেবারে অবসরের কাছাকাছি– এরকম শ্রমিকদের একাংশ মনে করছেন, অবসরের পর টাকা পেতে অনেক সমস্যা হয়– তাই এখন যদি সরকার তাদের সব পাওনা দিয়ে দেয়, তাহলে মিল বন্ধ মেনে নেবে তারা।

মিল কর্তৃপক্ষ এলাকায় কিছু স্কুল পরিচালনা করতো। সেগুলোর কী অবস্থা?

২৫টি বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানায় ৯টি স্কুল রয়েছে। খুলনায় রয়েছে এরকম ৬টি স্কুল। এই স্কুলগুলোও অনিশ্চয়তায় পড়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে এগুলোকে এমপিওভুক্ত করে দেয়া হবে। কিন্তু এমপিওভুক্ত করলে এসব স্কুলের শিক্ষকদের বর্তমান আর্থিক প্রাপ্তি অনেক কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাটকলগুলো বন্ধ হওয়া এবং শ্রমিকদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কী দেখছেন?

প্রধান রাজনৈতিক দল দুটি। এর মাঝে প্রধান বিরোধী দল নিষ্ক্রীয়। তারা আন্দোলনের কোন কর্মসূচি দেয়নি। তাদের কর্মীরা কখনো কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন কর্মসূচিতে শরিক হয় বটে। আর সরকারি দলের স্থানীয় কর্মী-সংগঠকরা বলছে, তাদের মিল বন্ধের পক্ষে থাকতে বলা হয়েছে। ফলে তারা আন্দোলনের বিরুদ্ধে বা নিষ্ক্রীয়।

অন্যদিকে, সিবিএ নেতৃত্ব মিল এলাকা ছেড়ে দিয়েছে বা বাসায় অবস্থান করছে। তাদের চুপচাপ থাকার জন্য চাপেও রেখেছে প্রশাসন। তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের পাওনা থেকে হিস্যা নেয়ার যেসব অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন সময় সেটাকে প্রশাসন তাদের চুপ করানোর ক্ষেত্রে একটা হাতিয়ার করতে পেরেছে।

আপনারা মিল বন্ধের প্রক্রিয়ায় শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন। সেটা কীভাবে?

২৫টি মিল বন্ধ করা হলো ২ জুলাই রাতে। অথচ কাগজে পত্রে দেখা যাচ্ছে বন্ধের ঘোষণা কার্যকর হচ্ছে ৩০ জুন থেকে। অথচ ১ ও ২ জুলাইও শ্রমিকরা কাজ করেছে। তাদের সেই দুই দিনের কী হবে? আবার আইনে রয়েছে ৬০ দিনের মধ্যে পাওনা না দিয়ে শ্রমিকদের আবাসন থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। কিন্তু এখনও শ্রমিকরা পাওনা পায়নি। বকেয়া বাকি। অথচ ইতোমধ্যে হাফিজ জুট মিলে শ্রমিকদের আবাসনস্থল তথা কলোনি ছাড়তে বলা হচ্ছে। এরকম আরও কিছু ঘটনা আছে যেখানে শ্রম আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে বা ঘটছে।

[আগস্ট পর্যন্ত পরিস্থিতির বিবরণ ছিল এই সাক্ষাৎকারটি তখন গ্রহণ করা হয়]

-

সংবাদপত্র ভিত্তিক জরিপ

২০২০ সালে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ৪৩২

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ওপর পরিচালিত সেইফটি এন্ড রাইটসের জরিপে দেখা গেছে ২০২০-এ সারাদেশে ৩৭৩টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৪৩২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে।

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি ২৬টি দৈনিক সংবাদপত্র (১৫টি জাতীয় এবং ১১টি স্থানীয়) মনিটরিং করে এই তথ্য প্রকাশ করেছে। যেসকল শ্রমিক কর্মক্ষেত্রের বাহিরে বা কর্মক্ষেত্র থেকে আসা-যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান তাদের এ জরিপে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

সংবাদপত্রের কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছে পরিবহন খাতে। যাদের সংখ্যা মোট ১৬৮ জন। পরিবহন খাতের পরেই রয়েছে নির্মাণ খাত। নির্মাণ খাতে নিহত হয় ১১৭ জন শ্রমিক।

মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭৭ জন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৯৬ জন; মাঁচা বা ওপর থেকে পড়ে মারা গেছে ৪৩ জন; শক্ত বা ভারী কোন বস্তুর দ্বারা আঘাত বা তার নিচে চাপা পড়ে ৩৬ জন; ছাদ, আগুনে পুড়ে ১৮ জন; পাহাড় বা মাটি, ভবন, ছাদ বা দেয়াল ধসে ১৯ জন; বজ্রপাতে নিহত হয়েছে ১১ জন এবং রাসায়নিক দ্রব্য বা সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পানির ট্যাঙ্কের বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ১০ জন শ্রমিক মারা গেছে। এছাড়া অন্যান্য কারণে ২২ জন শ্রমিক নিহত হয়।

জরিপের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অধিকাংশ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার না করে বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ দেয়ার সময়, মটর চালু করতে গিয়ে, মাথার ওপরে বয়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইনের নিচে কাজ করতে গিয়ে বা নির্মাণ সাইটে লোহার রড নিয়ে কাজ করার সময় শক্তিশালী বিদ্যুতের লাইন লোহার রড স্পর্শ করার ফলে। নির্মাণাধীন ভবনের পার্শ্বে বেড়া বা গার্ড তৈরী না করার ফলে লোহার রড বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসে।

রির্পোটে বলা হয়, নিয়মানুযায়ী যথাযথভাবে মাঁচা তৈরী না করার ফলে মাঁচা ভেঙ্গে বা মাঁচা থেকে পড়ে প্রায়ই শ্রমিক নিহত হচ্ছে। এছাড়া, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা বা যথাযথ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি না থাকা বা নিয়মিত মহড়া না দেয়া বা বিকল্প বহির্গমনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে অগ্নিকান্ডে শ্রমিক মারা যায়।

পাটশিল্পের উন্নয়নে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)-এর প্রস্তাব

[২০২০ সালে সরকার যখন রাষ্ট্রীয় খাতের পাটকলগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় তখন 'স্কপ' ২৮ জুন এই খাতের সংস্কার ও উন্নয়নে যে প্রস্তাব দেয় তার একটা সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এখানে তুলে ধরা হলো। সম্পাদক]

বরাবর,
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : মহান মুক্তিযুদ্ধের সুফল হিসেবে অর্জিত রাষ্ট্রায়াত্ব পাটশিল্প তথা বিজেএমসিকে কার্যকর লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করতে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে সংস্কার কর্মসূচি সরকারের বিবেচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পেশ করা হচ্ছে।

জনাব,

পাটচাষ এবং পাটশিল্পের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি জড়িত। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় আর পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানে পাটশিল্পই ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। ১৯৫২ সালে নারায়ণগঞ্জে বাওয়া জুট মিল স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় পাটশিল্পের যাত্রা। বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের সাথে পাটশিল্প অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে পাটকল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) গঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রায় দেড়যুগ প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল পাট এবং পাটজাত পণ্য। পরবর্তীকালে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ভুল পরামর্শ, সরকারের ভ্রান্তনীতি, ব্যবস্থাপনার দক্ষতার অভাব, নির্বাহী কর্মকর্তাদের জবাবদিহীতার যথাযথ প্রথা না থাকা, সর্বোপরি যথাসময়ে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তালমিলিয়ে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন না করার কারণে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প আজ মৃতপ্রায়। অথচ বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশ প্রায় ৭ হাজার ৭ শত কোটি টাকার পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এরকম রপ্তানীর পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছেও। আবার বিজেএমসির পরিচালনাধীন কারখানাগুলিতে লোকসানের পরিমাণ বাড়ছে। অথচ বেসরকারী মালিকানায় নতুন নতুন পাটকল গড়ে উঠছে। আমরা মনেকরি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিজেএমসিকে আবার সক্ষম প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

বর্তমানে বিজেএসসি পরিচালিত ২২টি কারখানায় হেসিয়ান, সেকিং এবং সিবিসি ধরনের মোট ১০ হাজার ৮৩৫টি তাঁত বিদ্যমান। যার মধ্যে হেসিয়ান তাঁত ৬ হাজার ২৩২টি, সেকিং তাঁত ৩ হাজার ৬৯৬টি এবং সিবিসি তাঁত ১ হাজারটি। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় তাঁতের তুলনায় এই তাঁতসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা কম। আবার পুরানো হওয়ায় এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা আরও কমেছে। হেসিয়ান তাঁতের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক মাত্র ১৬ মে. টন, সেকিং তাঁতের ৩৯ মে. টন এবং সিবিসি তাঁতের ১৮ মে. টন। অথচ চাইনিজ Tungda TD 788 Model এবং Victor 1101 Jute repier Loom স্বয়ংক্রিয় তাঁত বছরে ৩৬ মে. টন উৎপাদন করতে সক্ষম। আর দক্ষতার সাথে সরবরাহ চুক্তি করতে পারলে স্বয়ংক্রিয় তাঁত সরবরাহকারী কোম্পানিই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেবে। কিন্তু পুরাতন তাঁত পরিবর্তন করে নতুন প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় তাঁত স্থাপন না করে শুধু পুরাতন তাঁত সংস্কারে (বি.এম.আর) অর্থ ব্যয় হবে অপচয়।

বিজেএমসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে কারখানাগুলির পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে আধুনিক তাঁত স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে মাথাপিছু ব্যয় কমানোর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। ...

...এভাবে বিজেএমসি-এর হেসিয়ান তাঁতের উৎপাদন প্রায় ৮০ হাজার মে. টন হতে ১ লক্ষ টনে উন্নীত হতে পারে। এই উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য ৬ মাসের পাটের মজুদ গড়ে তুলতে হবে। উক্ত পাট মজুদের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা এবং মেশিনারিজ মেরামত, স্থাপন ও পরিবহন এবং সমগ্র প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে। মেইনটেনেন্সের ক্ষেত্রে যে যন্ত্রাংশ প্রয়োজন তা বিজেএমসির পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও সামরিক বাহিনী পরিচালিত মেশিন টুলস কারখানা হতে সংগ্রহ করতে হবে। মেইনটেনেন্সের ক্ষেত্রে মেশিন টুলস কারখানার ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা নেওয়া যায়। সংস্কার কর্মকান্ড চলমান অবস্থায় শ্রমিকদের সাময়িক কর্মহীন থাকার সময় প্রায় চার মাস শ্রমিকদের ৫০ ভাগ মজুরী দিতে হবে। সে জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে। এভাবে সর্বসাকুল্যে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় বর্তমানে কর্মরত শ্রমিক উদ্বৃত্ত হবে না। বরং উৎপাদন বাড়ায় নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। যেখানে শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

এই সংস্কারের মধ্যদিয়ে বিজেএমসি'র ১০ হাজার ৪০০টি তাঁতের উৎপাদন শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আধুনিক স্বয়ংক্রিয় টেকনোলজিতে রূপান্তরিত হবে। ফলে বিজেএমসি আত্মনির্ভরশীল কার্যকর এবং সরকারি কোন সাবসিডি ছাড়াই পরিচালিত হতে পারবে। এই উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য শুধু হেসিয়ান তাঁত হতেই দাঁড়াবে প্রায় ১৩ শ' কোটি টাকা এবং সেকিং ও সিবিসি তাঁত হতে আরো প্রায় হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত যোগ হবে।

...এটা এখন পরিষ্কার, শত বছরের পুরানো স্কটল্যান্ড টেকনোলজিতে বর্তমানে পাটশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা, পাটের মূল্য পরিশোধ এবং শ্রমিকদের মজুরীসহ অন্যান্য ব্যয় বহন করতে পারছে না। তাই এই শিল্পের বিকাশ ও পুনর্জীবনের জন্য শ্রমঘনশিল্পের পরিবর্তন করে পুঁজিঘন আধুনিক স্বয়ংক্রিয় উন্নত টেকনোলজি গ্রহণ জরুরি। আমরা যদি চাইনিজ আধুনিক উন্নত টেকনোলজী গ্রহণ করি তাহলে উন্নত মানের পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

গত দশ বছর যাবৎ গড়ে ৭৫ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হচ্ছে। তার মধ্যে ৬১ লক্ষ্য বেল পাট আমাদের দেশে শিল্প কারখানা ও অন্যান্য খাতে ব্যবহার হয়। ১০-১২ লক্ষ বেল রপ্তানী হয়। আমরা যদি লাভজনক পাট শিল্পখাত গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের আরো ১০ লক্ষ বেল উন্নতমানের পাট উৎপাদন করতে হবে। এই জন্য পাট অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিয়ে পাটের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে, পাটচাষিরা যেন লাভজনক মূল্য পায়। পাশাপাশি ৭৭টি পাটকলকে পরিচালনা করতে গঠিত বিজেএমসির বিদ্যমান কাঠামোকে পরিবর্তন করে পাটকলগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালনার সার্বিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। মিলগুলোতে সংস্কারের সাথে সংগতি রেখে ডেপুটি ম্যানেজার ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের পদসহ অপ্রয়োজনীয় পদ বিলুপ্ত করে ব্যয় কমাতে হবে। উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বিকশিত করতে সহকারী উৎপাদন কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়াতে হবে।

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের পক্ষে

ফজলুল হক মন্টু এবং আলহাজ্ব, এ.কে.এম আযম খসরু– জাতীয় শ্রমিক লীগ
আনোয়ার হোসেন এবং নূরুল ইসলাম খান নাসিম– বাংলাদেশ জাতীয়বাদী শ্রমিক দল
সহিদুল্লাহ চৌধুরী এবং ডা: ওয়াজেদুল ইসলাম খান– বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
শাহ মোঃ আবু জাফর এবং এড. মো: দেলোয়ার হোসেন খান– বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন
সাইফুজ্জামান বাদশা এবং নাইমুল আহসান জুয়েল– জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ
কামরুল আহসান এবং আমিনুল হক আমিন– জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
আব্দুল মুকিত খান এবং আমিনুর রশিদ চৌধুরি (রিপন)– বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস
শামীম আরা এবং মজিবুর রহমান– বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
রাজেকুজ্জামান রতন এবং আহসান হাবিব বুলবুল– সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
হাবিবুল্লাহ এবং চৌধুরি আশিকুল আলম– বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ
মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ এবং মো. নুরুল আমিন– জাতীয় শ্রমিক জোট।

[সংক্ষেপিত]

বিআইডিএস-এর গবেষণা : নতুন করে বিপুল মানুষ দরিদ্র হলো

২০২০-এর শুরুতে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ২০ দশমিক ৩ শতাংশ। মার্চে নভেল করোনাভাইরাসের আক্রমণের পর থেকেই কাজ হারাতে থাকে মানুষ। বন্ধ হয়ে যায় বহুজনের আয়-রোজগারের পথ, বাড়তে থাকে দারিদ্র্য। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) জুনে তাদের এক গবেষণা প্রকাশ করে জানিয়েছে, ২০২০-এ জুনের মধ্যেই দেশে ১ কোটি ৬৪ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। বছরের তৃতীয় ও শেষ প্রান্তিকে মানুষের আয় কিছুটা বাড়লে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরও বছর শেষে দারিদ্র্যের হার ২৫ শতাংশ ছাড়াতে পারে।

'প্রোভার্টি ইন দ্য টাইম অব করোনা: শর্ট টার্ম ইফেকটস অব ইকোনমিক স্লোডাউন অ্যান্ড পলিসি রেসপন্স থ্রু সোস্যাল প্রটেকশন' শীর্ষক এ গবেষণা পরিচালনা করেছেন বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক ড. বিনায়ক সেন। ২৪ জুন গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করা হয়।

শহুরে শ্রমিকের আয় কমেছে ৮০ ভাগ; গ্রামে ১০ ভাগ

উপরোক্ত গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ২০২০ সালের শুরুতে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ২০ দশমিক ৩ শতাংশ। এর মধ্যে শহরে ১৫ দশমিক ৮; গ্রামে ২২ শতাংশ। তবে ২০২০ শেষে গ্রামে দারিদ্র্যের হার ২৪ দশমিক ২৩ এবং শহরে ২৭ দশমিক ৫২ শতাংশ হতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রামের চেয়ে শহরে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। বছরের শেষে দেশে চরম দারিদ্র্য থাকবে ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ, যা বছরের শুরুতে ছিল ১০ দশমিক ১ শতাংশ।

দারিদ্র্যের হারের এ পরিবর্তন হিসাব করতে শ্রমিকের আয় কতটুকু আগের অবস্থায় ফিরে আসছে তা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে যদি শ্রমিকের আয় ৫০ শতাংশ এবং শেষ প্রান্তিকে যদি ৫০ শতাংশ আয় উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলে দারিদ্র্যের হার ২৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে। শ্রমিকের আয় এ হারে উদ্ধার না হলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। এরই মধ্যে শহরের শ্রমিকের আয় কমেছে ৮০ শতাংশ এবং গ্রামীণ শ্রমিকের আয় কমেছে ১০ শতাংশ।

ড. বিনায়ক সেন বলেছেন, কোভিড-১৯-এর প্রভাব কাটাতে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ লকডাউন অর্থনৈতিকভাবে খুব বেশি টেকসই নয়। লকডাউনে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধির পাশাপাশি কোভিডের আগে থেকেই যারা দরিদ্র ছিল তাদের

জীবন মহামারিকালে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কেবল সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে এ ক্ষতি পূরণ করা যাবে না। বরাদ্দ বাড়িয়েও লাভ হচ্ছে না। কারণ ভাতা ও সহায়তা প্রদানে ভুল মানুষ বাছাইয়ের প্রবণতা আছে। এ সহায়তা যাদের দরকার, তাদের অনেকে তালিকায় ঢুকতে পারে না। সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন ভাতা বিতরণে অদরিদ্র ও সচ্ছল মানুষের সংখ্যা ৩০ শতাংশ, খাদ্যসহায়তার ক্ষেত্রে সেটা ৩২ শতাংশ, মাতৃত্বকালীন ভাতায় ৪৪ শতাংশ এবং বৃত্তির ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ।

বেকারের হার বেড়ে ৩০ শতাংশ; আয় কমেছে সবার; বেড়েছে খাবার খরচ

বর্তমান অবস্থায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে দারিদ্র্যের হার শূন্যে নামিয়ে আনতে হলে আগামী এক দশক গড়ে ৮ শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এই প্রবৃদ্ধি অর্জন কঠিন। তাছাড়া সামনে আরো কঠিন পরিস্থিতি হতে পারে। ফলে এসডিজির দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হয়ে আছে।

বিআইডিএস-এর আলোচ্য গবেষণা উদ্যোগে আরও যেসব তথ্য উঠে এসেছে তার মধ্যে আছে দেশে বেকারের হার ছাড়িয়েছে ৩০ শতাংশ। অন্যদিকে লকডাউনে এমএসএমই খাতে ক্ষতি প্রায় ৯২ হাজার কোটি টাকা। বন্ধের উপক্রম প্রায় ৪৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠান।

'কোপিং উইথ কভিড-১৯ অ্যান্ড ইনডিভিজুয়াল রেসপন্স: ফাইন্ডিংস ফ্রম এ লার্জ অনলাইন সার্ভে' শীর্ষক গবেষণায় বেকারত্বের বিষয়টি উঠে আসে। এই গবেষণাটি পরিচালনা করেন বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুরশিদ। সেখানে দেখা যায়, করোনার আগে মোট বেকার ছিল ১৭ শতাংশ। করোনার কারণে নতুন করে ১৩ শতাংশ মানুষ বেকার হয়েছে। যেসব পরিবারের মাসিক আয় ৫ হাজার টাকার নিচে সেই পরিবারের আয় কমেছে প্রায় ৭৫ শতাংশ। অন্যদিকে আয় ১৫ হাজার টাকার নিচে এমন পরিবারের আয় কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ। আয় ৩০ হাজার টাকার নিচে এমন পরিবারের আয় কমেছে প্রায় ২৫ শতাংশ।

সারণী-৩: করোনাকালে আয় কমার চিত্র (বিআইডিএস-এর হিসাব)

পরিবারের আর্থিক ধরন	আয় কমার ধরন
যেসব পরিবারে মাসিক আয় ৫ হাজার টাকার নিচে	কমেছে প্রায় ৭৫ শতাংশ
যেসব পরিবারে আয় ১৫ হাজার টাকার নিচে	কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ
যেসব পরিবারে আয় ৩০ হাজার টাকার নিচে	কমেছে প্রায় ২৫ শতাংশ
করোনাকালে আয় কমার গড় চিত্র (সরকারি জরিপ)	
মহামারির সময়ে দেশের মানুষের আয় কমেছে ২০ শতাংশ	

গবেষণাকালে দেখা গেছে চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি মানুষ করোনা উপসর্গ নিয়ে বসবাস করছিল। চট্টগ্রামে প্রায় ২০ শতাংশ, ঢাকায় ১৩ ও খুলনায় ৮ শতাংশ মানুষের করোনা উপসর্গ ছিল সেসময়। করোনার কারণে বছরের মাঝামাঝি ১০ শতাংশ খাদ্যমূল্য বেড়েছে। বছরের শেষে এ অবস্থা আরও খারাপ হয়। ফলে সব ধরনের পরিবারে খাদ্য ব্যয় বেড়েছে।

অন্যদিকে একই সংস্থার গবেষক ড. মনজুর হোসেনের গবেষণায় দেখা গেছে, জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ। শিল্প খাতের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮৬ শতাংশ হতো এসএমইতে। এ খাত থেকে প্রতি মাসে আয় হতো প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। লকডাউনের সময় দুই মাসে এই খাতে ক্ষতি ৯২ হাজার কোটি টাকা। খাতটির জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। স্বল্প সুদে এই খাতের উদ্যোক্তারা এই ঋণ নিতে পারবেন। যদিও এই সুবিধা সবাই নিতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। কেননা ৩৮ শতাংশ মাত্র এসএমই প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক ঋণের প্রবেশগম্যতা আছে।

বন্ধের উপক্রম ৪১ শতাংশ এসএমই; পারিশ্রমিক কমছে সর্বত্র

জুনের উপরোক্ত সেমিনারে 'কোভিড-১৯ অ্যান্ড এসএমইএস: আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি ইমিডিয়েন ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড কোপিং স্ট্র্যাটেজিস' শীর্ষক আরেকটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে বিআইডিএসের তরফ থেকে বলা হয়েছে, লকডাউনে সরবরাহ চেইন বিঘ্নিত হওয়া, অবিক্রীত পণ্যের স্তূপ ও উৎপাদিত পণ্যের দাম আটকে থাকায় ৪১ শতাংশের বেশি এসএমই প্রতিষ্ঠান বন্ধের উপক্রম হয়েছে। এসব কারণে চলতি বছরে এসএমই খাতে ৬৬ শতাংশ পর্যন্ত আয় কমতে পারে।

করোনার কারণে ৮০ শতাংশ বেতন দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন মালিকরা, যদিও শ্রমিকরা বলছে ৫৫ শতাংশ বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে আগামীতে বেতন পরিশোধ হবে না এমন ধারণা করছে ৬৩ শতাংশ মানুষ। নভেম্বর-ডিসেম্বরে করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় উপরোক্ত নাজুক অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত আরও খারাপ রূপ পায় কিনা তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবীদের ২০২০ শেষ হচ্ছে।

-

সরকারি ভাষ্য 'মহামারিতে আয় কমেছে'

করোনাকালে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিয়ে বেসরকারি বিভিন্ন ভাষ্যের পাশাপাশি সরকারি তরফ থেকেও একটি ভাষ্য পাওয়া যায় ৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর জরিপের উল্লেখ করে জানানো হয় যে, মহামারির সময়ে দেশের মানুষের আয় কমেছে ২০ শতাংশ। ১৩ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ৯৮৯টি পরিবারের মাঝে জরিপ চালিয়ে এই তথ্য মিলেছে।

জরিপের ফল বলছে, করোনার আগে গত মার্চ মাসে প্রতি পরিবারে মাসিক গড় আয় ছিল ১৯ হাজার ৪২৫ টাকা। আগস্ট মাসে তা কমে দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৪৯২ টাকা। সেই হিসাবে পাঁচ মাসের ব্যবধানে পরিবারের গড় আয় কমেছে ৩ হাজার ৯৩৩ টাকা। পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের সামনে জরিপের এই ফলাফল তুলে ধরেন। জরিপের ফল অনুযায়ী, আয়ের পাশাপাশি দেশের মানুষের ব্যয়ও কমেছে। মার্চ মাসে পরিবার প্রতি মাসিক খরচ ছিল ১৫ হাজার ৪০৩ টাকা। আগস্ট মাসে তা কমে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ১১৯ টাকা। অর্থাৎ পাঁচ মাসের ব্যবধানে পরিবার প্রতি খরচ কমেছে ১ হাজার ২৮৪ টাকা। এর মানে, আয় কমে যাওয়ায় ভোগের চাহিদাও কমেছে। এ ছাড়া জরিপে অংশ নেওয়া পরিবারগুলোর মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ পরিবার করোনার সময় কোনো না কোনোভাবে আর্থিক সমস্যায় পড়েছে।

করোনাকালের অর্থনীতি ও সমাজ ভাবনা:
চার অর্থনীতিবিদের চোখে

এক.

‘একমাত্রিক জিডিপির মাধ্যমে উন্নয়নকে বোঝার চেষ্টা ইতিমধ্যে বড় ধাক্কা খেয়েছে’

– হোসেন জিল্লুর রহমান; ১২ এপ্রিল ২০২০, প্রথম আলো

“...এপ্রিলে কঠোর লকডাউনে পড়া দরিদ্র ও অভাবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্যোক্তা শ্রেণী) অনানুষ্ঠানিক খাতের মানুষ। তাদের জন্য বড় অঙ্কের প্যাকেজ খুব জরুরি ছিল। ...

...একমাত্রিক জিডিপির মাধ্যমে উন্নয়নকে বোঝার যে চেষ্টা আছে, তা ইতিমধ্যেই বড় ধাক্কা খেয়েছে। আমি আগ থেকেই বলে আসছিলাম, গার্মেন্ট এবং প্রবাসী আয় দুই ‘চালকের’ ওপর নির্ভরতার সময় ফুরিয়ে আসছে। এখন প্রবৃদ্ধির নতুন চালক খুঁজতে হবে। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে একটা নতুন উন্নয়ন ধারণা লাগবে। নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এ সংক্রান্ত চিন্তায় পরিবর্তন

আনাটা বড় জরুরি হয়ে পড়েছে।...

...করোনাকালে একটা স্বল্পমেয়াদি দারিদ্র্য বৃদ্ধির বাস্তবতা খুবই সুনির্দিষ্টভাবে দেখা দিল। এই সংকট কেটে গেলে সেপ্টেম্বরের পর নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আর প্রণোদনা তো মূলত কতিপয় গোষ্ঠীর, তাই না? দেশের অর্থনীতির বিকাশে এইসব খাতের ভূমিকা আছে, সেটা গুরুত্ব দিই, স্বীকার করি। কিন্তু তাদের ওপরেই ভিত্তি করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আসার যে ধারণা তারা দিয়ে চলেন, সেটা সার্বিক বিচারে সঠিক নয়। তারা না থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বসে যাবে, তারা ছাড়া দেশ চলবে না, এভাবে আমাদের অনেকের চিন্তাকে তারা জিম্মি করে রেখেছে। এই ভ্রান্তি, এই চিন্তার দৈন্য থেকে আমাদের মুক্তি দরকার।...”

দুই.

‘নতুন দরিদ্রদের অধিকাংশই অস্বচ্ছল ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার’

– ড. বিনায়ক সেন, গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা (বিআইডিএস); ডয়েচ ভেলে, ৩ জুলাই ২০২০

‘...মধ্যবিত্ত বলতে আমরা আসলে বুঝি যারা দারিদ্র্য রেখার উপর আছেন। দারিদ্র্য রেখার উপরে তো ধনীরাও আছেন, ঝুঁকিতে থাকা অস্বচ্ছল পরিবারও আছে। দারিদ্র্য রেখা যদি ১ ডলার ধরেন, তাহলে ঝুঁকিতে থাকা অস্বচ্ছল পরিবারের মাথাপিছু আয় দৈনিক এক থেকে দুই ডলার। আর ২ থেকে ৪ ডলারের মধ্যে যারা, তারা হচ্ছে মধ্যবিত্ত। এই হিসেবে ১ থেকে ২ ডলারের মধ্যে যারা, এই সংখ্যাটা ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। আর ২ থেকে ৪ ডলারের মধ্যে যারা, অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত যাদের আমরা বলছি, তারা ১৯৯১ সালে ছিল ১০ শতাংশ। কালক্রমে এটা বেড়েছে। কোভিড পরিস্থিতির আগে প্রায় ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। মহামারিতে কী পরিমাণ মধ্যবিত্ত দরিদ্রের কাতারে নেমেছে সে হিসাব আমাদের নেই। তবে আমাদের কাছে দারিদ্র্য সীমার নীচে কত মানুষ নেমে গেছে সেই হিসাব আছে। সেই হিসাবটি হলো, দেড় থেকে আড়াই কোটির মতো। আমার মতে, এই নতুন দরিদ্রদের অধিকাংশ অস্বচ্ছল ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার। কারণ, মহামারির লকডাউনের সময় তাদের মজুরি শ্রমের কোনো সুযোগ ছিল না। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও কোনো ব্যবসা ছিল না।

অন্যদিকে, মধ্যবিত্তের হিসাবটা একটু জটিল। তাদের মূল আশ্রয়স্থল হলো তারা মাসিক বেতনের চাকরি করে। মধ্যবিত্তদের ব্যাংকের সঙ্গে একটা লেনদেন আছে। তাদের মোটামুটি একটা সঞ্চয় আছে।

আমি আশঙ্কা করি, অর্থনীতির যে স্থবির অবস্থা, সেটা যদি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে, তাহলে ৩০ শতাংশ মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে যাবে।...”

তিন.

‘জনগণের লুণ্ঠিত সম্পদের একাংশ দিয়েই সঙ্কট মোকাবিলা সম্ভব’

– আনু মুহাম্মদ, ৫ এপ্রিল ২০২০, দৈনিক মানবজমিন

আমাদের এখানে গড়ে ৬ কোটির কিছু বেশি মানুষ শ্রমজীবী। তার মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করে এমন শ্রমিক রয়েছে পাঁচ কোটির বেশি। যারা নিজেরাই নিজেদের কাজ তৈরি করে। সেটা হকার হোক, রিকশাচালক হোক। যাদের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন নেই; যাদের কোনও সরকারি সমর্থন নেই; যাদের নিরাপত্তা নেই। যারা দিনে কাজ করলে তার আয় হয়, কাজ না করলে আয় হয় না। তার আয় না হলে কি হবে এটা কেউ জানে না। রাষ্ট্র তাদের কোনও দায়-দায়িত্ব নেয় না। সামাজিক নিরাপত্তায় আমরা কোথায়– সোশ্যাল সেফটির জায়গায় বাংলাদেশ বহু দেশের তুলনায় অনেক দুর্বল। বাংলাদেশের তুলনায় জিডিপি দুর্বল অনেক দেশ সামাজিক নিরাপত্তায় অনেক এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের কোন নাগরিক যদি বিপদে পড়ে তা দেখার মতো প্রতিষ্ঠান নেই। বেকার হলে তো নেই-ই। করোনার মতো বিপদে তো আরও নেই। চিকিৎসা বা দুর্ঘটনা হলেও নেই। এমনভাবে নাগরিকদের বিপদে বিচ্ছিন্ন বা নির্লিপ্ত থাকা রাষ্ট্র খুব কমই আছে দুনিয়ায়।

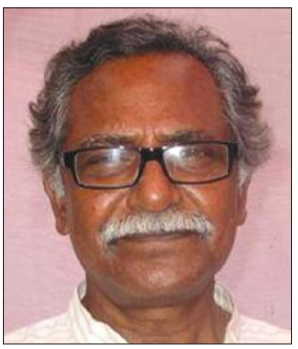

এখন আমরা পাঁচ কোটি শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে যদি তাদের পরিবার ধরি, তাহলে প্রায় নব্বই শতাংশ দাঁড়ায়। এদের জীবনের সঙ্কট মোকাবিলায় রাষ্ট্রকেই উদ্যোগ নিতে হবে। এদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাংক বা এডিবির কাছে ঋণ চাওয়ার কিছু নেই বা জনগণের ঘাড়ে বাড়তি কর চাপাবারও কিছু নেই। দশ বছরে যদি আট লক্ষ কোটি টাকা বাইরে পাচার হয় বা দুই লক্ষ কোটি টাকা ঋণখেলাপি হয় এখানেই তো দশ লক্ষ কোটি টাকা। এর এগারো বা বারো ভাগের একভাগ যদি সরকার নিতে পারে তাহলেই বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সরকার বলতে পারে বিদেশে পাচার করা অর্থ কিভাবে আনবে? বিদেশ থেকে অর্থ না আনতে পারলেও তাদের চিহ্নিত করা নিশ্চয় কঠিন নয়। তাদের দেশের ভেতরে যে সম্পদ আছে তা বাজেয়াপ্ত করে এই অর্থ উদ্ধার সম্ভব।

সরকার যদি না চায় তাহলে জনগণের ওপর নতুন করের বোঝা চাপানো এবং বিশ্বব্যাংকের ঋণে জড়ানো দরকার হবে। আর সে পথে গেলে আমরা বিপদমুক্ত হতে পারব না। বরং নতুন করে আরেকটি সঙ্কটের আবর্তে নিপতিত হবো।...”

চার.

‘সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ গঠন জরুরি’

– রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, প্রথম আলো, ৭ জুন ২০২০

“...মহামারি সামলাতে ঋণভিত্তিক প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এমএসএমই) শিল্পখাতকেও ঋণ দেওয়া হবে। কিন্তু তারা কি ঋণ পাবে? তারা তো বেশির ভাগ ঋণ নেয় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে। অনেকে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা থেকে নেয়। তাদের জন্য বাস্তবে সমান সুযোগ রাখা হয়নি। একটা আদর্শ ঋণব্যবস্থা তৈরি হলে ভালো হতো। কিন্তু ঋণ তো দেওয়া হবে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে। ফলে একটা গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে এবং ব্যাংকের পরিচালক যাঁরা আবার ব্যবসায়ীও, তাঁদের মধ্যে একটা সমঝোতার সম্পর্ক তৈরি হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারের বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। যা বরাদ্দ থাকে, তা আবার দুর্নীতিগ্রস্ত। কর্মসূচিগুলো সর্বজনীন নয়,

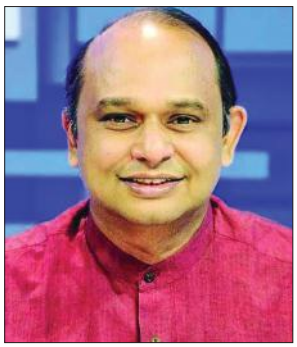

নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে নেওয়া এবং ত্রাণ বা খয়রাতভিত্তিকও। অর্থাৎ নাগরিক অধিকারভিত্তিক নয়। আবার উপকারভোগী নির্বাচন করা হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। করোনাকালে কী দেখেছি? দুটি পয়সার আশায়, চারটি ভাতের আশায় মানুষ মরণকামড় দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। শতাধিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আছে। কিন্তু এগুলো কোনো একক ও সমন্বিত প্রশাসনিক ছাতার আওতায় নেই। দেশে একটি সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ গঠন এখন জরুরি।

স্বাস্থ্যখাতের অবস্থা জবুথবু। বরাদ্দ জিডিপির ১ শতাংশের কম। যা বরাদ্দ হয়, তা আবার ঠিকমতো খরচ হয় না। যা খরচ হয়, তার মান নিয়ে প্রশ্ন থাকে। এমন একটা স্বাস্থ্যখাত নিয়ে আমাদের মধ্যম আয়ের দেশের দিকে যাত্রা কি আদৌ সম্ভব? ব্যক্তিখাতে চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। প্রত্যেক নাগরিকের নির্দিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকার্ড থাকা চাই, সর্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা চাই। স্বাস্থ্য প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আলাদা ভাগ করে পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে হবে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্বাধীন স্বাস্থ্য কমিশন গঠন করা যেতে পারে।...”

-

অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে হলে শ্রমজীবীদের জীবন-মান উন্নয়নে যেকোন ব্যয়কে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে বাজেট বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

কোভিড-১৯ এর দিনগুলোতে পোশাক শিল্প

শ্রমিকরা দুশ্চিন্তায় ছিল ও আছে

কোভিড-১৯ এর রেশ যায়নি এখনও। কোন সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের জনজীবনে এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার ফল বইতে হবে অনেকদিন। এর কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমজীবীরা– এও সবাই স্বীকার করছেন। মহামারির কারণে সৃষ্ট সংকটের মধ্য দিয়েই যাচ্ছে শ্রমবাজার এখনও।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার পোশাক শিল্প। করোনার ফলে এ খাতের অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে, অনেক শ্রমিক চাকুরি হারিয়েছে, কেউ কেউ আবার কাজ ফিরে পেয়েছে ও পাচ্ছে বটে– কিন্তু পুরানো হারে মজুরি পাচ্ছে না। বহু শ্রমিক বাসাবাড়ি ছেড়েছে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে।

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক শিল্পাঙ্গনে শ্রমিক-কর্মসংস্থানের প্রধান হিস্যা পোশাক খাতের। রফতানি আয়েও প্রধান হিস্যা তার। বরাবরই এই খাতে প্রবৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী। করোনাকালে তার গতি কিছুটা কমেছে। দুঃখজনক হলো, প্রবৃদ্ধির গতি যতটা শ্লথ হয়েছে– শ্রমিক পরিবারগুলোতে সংকট গতি পেয়েছে তার চেয়ে বহু গুণ দ্রুততায়।

করোনাকালে পোশাক খাত

মহামারির সময় পোশাক খাত ছিল দেশে নীতিনির্ধারকদের চিন্তার কেন্দ্রে। কিন্তু তাতে শ্রমিকদের দুঃখযন্ত্রণা খুব বেশি কমেনি। বরং কারখানা খোলা ও বন্ধ রাখার বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে কয়েক দফায় শ্রমিকরা ভোগান্তির শিকার হয়। বাড়ি থেকে একবার বের হওয়ার কিছুদিন পর অনেক স্থানে বাড়ির মালিকরা আবার শ্রমিক পরিবারকে সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছিলো না। এর পাশাপাশি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটে অনেক। এ কারণে আবার অনেককে বাসা ছাড়তে হচ্ছিলো। ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শারীরিক দূরত্ব অগ্রাহ্য করে শ্রমিকদের বিক্ষোভের ঘটনাও দেখা গেছে। শ্রম বিষয়ক একটি গণমাধ্যম ('শ্রমিক আওয়াজ') সূত্র দাবি করেছে, ২০২০ এর ৮ জুলাই পর্যন্ত ১৯৩টি কারখানায় প্রায় সাড়ে চার শ' শ্রমিক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। যার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে ছয় জন। পরবর্তী সময়েও এরকম ঘটনা ঘটেছে।

অবস্থা যখন খারাপ থেকে দুঃসহ

পোশাক খাত বাংলাদেশে শিল্পের ইতিহাসে ক্রমাগত সুনামের ভাগিদার হলেও এই খাতে শ্রমিক বিপন্নতার কাহিনীও অতি পুরানো। সর্বশেষ এই খাতে শ্রমিক ছাঁটাই ব্যাপকতা পেয়েছিল ২০১৯-এ। ঐ বছর মজুরি কাঠামোকেন্দ্রীক অসন্তোষে আন্দোলনরত শ্রমিকদের প্রায় ১২ হাজার চাকুরিচ্যুত হন বলে দাবি করে থাকে ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। বিলস্-এর সংবাদপত্র জরিপ অনুযায়ী এ বছর পোশাক খাতে

১৩১টি আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। প্রায় ৮৭টি কারখানায় বড় অংকে ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। চারটি প্রধান শিল্পাঞ্চলে প্রায় ছয় হাজার শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলাও হয় এসময়। দুর্ভাগ্যজনক এই ধারাবাহিকতাতেই ২০২০ সালে করোনার আবির্ভাব এবং শ্রমিকদের জীবনে আরেকদফা বিপর্যয়ের শুরু। দৈনিক কালের কণ্ঠকে (২৫.০৭.২০২০) উদ্বৃত করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস্) ২৭ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, মহামারিকালে বিভিন্ন নাগাদে পোশাক খাতে প্রায় তিন লাখ শ্রমিক বেকার হয়েছে এবং লে-অফ হয়েছে প্রায় দুই হাজার কারখানা। একই সময়ে প্রায় ২৭ শতাংশ শ্রমিককে খাদ্য চাহিদা কমাতে হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানেই পোশাক শ্রমিক নেতা আমিরুল হক আমিন বলেন, করোনাকালে শ্রমিকরা তিনটি ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে: এক. নিরাপত্তার ঝুঁকি; দুই. চাকুরি হারানোর ঝুঁকি এবং তিন. কাজ করেও বেতন না পাওয়ার ঝুঁকি। তাঁর ভাষায় মার্চ থেকে করোনার অজুহাতে ছাঁটাই চলছে। বিশেষ করে প্রতিবাদী শ্রমিকদের বেশি ছাঁটাই করা হচ্ছে। আবার ৫ বছরের কম অভিজ্ঞদেরও ছাঁটাই করা হচ্ছে। কারণ এদের ছাঁটাই করা হলে আইনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। উল্লেখ্য, ৩১ জুলাইয়ের দৈনিক যুগান্তর শিল্প পুলিশের তথ্য উদ্বৃত করে জানিয়েছিল, প্রায় এক হাজার কারাখানায় বেতন পরিশোধ করা হয়নি। অথচ একই সময়ে পোশাক খাতসহ রফতানিমুখী শিল্পখাতসমূহ মহামারিজনিত সংকট সামাল দিতে তিন দফায় প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি উদ্দীপনামূলক রাষ্ট্রীয় সহায়তা তহবিল পেয়েছে। অর্থাৎ এসব তহবিল এই খাতের উদ্যোক্তাদের যতটা সহায়তা দিয়েছে– ততটা সহায়তা পায়নি বলে দাবি করেছে শ্রমিকরা।

২৭ শতাংশ শ্রমিককে খাদ্য চাহিদা কমাতে হয়েছে। ৫ বছরের কম অভিজ্ঞদেরও ছাঁটাই করা হচ্ছে। কারণ এদের ছাঁটাই করা হলে আইনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। উল্লেখ্য, ৩১ জুলাইয়ের দৈনিক যুগান্তর শিল্প পুলিশের তথ্য উদ্বৃত করে জানিয়েছিল, প্রায় এক হাজার কারাখানায় বেতন পরিশোধ করা হয়নি। অথচ একই সময়ে পোশাক খাতসহ রফতানিমুখী শিল্পখাতসমূহ মহামারিজনিত সংকট সামাল দিতে তিন দফায় প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি উদ্দীপনামূলক রাষ্ট্রীয় সহায়তা তহবিল পেয়েছে। অর্থাৎ এসব তহবিল এই খাতের উদ্যোক্তাদের যতটা সহায়তা দিয়েছে– ততটা সহায়তা পায়নি বলে দাবি করেছে শ্রমিকরা।

সংগঠন করা এবং সংঘবদ্ধ হওয়া আজও কঠিন

পোশাক খাতে মজুরি ও চাকুরির নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি সংগঠিত না হতে পারার পুরানো সমস্যাও রয়ে গেছে এ বছর। সংগঠিত হওয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের অধিকার। অথচ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্প হয়েও

পোশাক খাতে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা মাত্র ৮৮০টি। এই খাতে কর্মরত মোট জনশক্তির মাত্র ৯.৬৫ শতাংশ বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত। শ্রমিক সংগঠকরা বরাবরই অভিযোগ করে থাকেন, শ্রমআইনের সকল শর্ত মেনে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন করলেও অযৌক্তিক সব কারণ দেখিয়ে নিবন্ধন আবেদন বাতিল করে দেয়া হয়। ২৬ জুন প্রথম আলো লিখেছে, 'কোভিড পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রমিকদের চিহ্নিত করে ছাঁটাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নেতারা।'

একদিকে কোভিডের শারীরিক ও সামাজিক ছোবল, অন্যদিকে আয় রোজগারে বিড়ম্বনা মিলে করোনাকালে দেশের অন্যান্য খাতের শ্রমজীবীদের মতোই তৈরি পোশাকখাতেও শ্রমিকদের মাঝে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেড়েছে বলে গবেষকরা অনুমান করতে শুরু করেছেন ইতোমধ্যে।

এই দারিদ্র্যের একটা পার্শ্বফল হিসেবে শ্রমিক পরিবারের শিশুদের মাঝে আবারও শ্রমে যুক্ত হওয়ার হার বাড়বে বলে শঙ্কার কথা জানিয়েছে আইএলও এবং ইউনিসেফ। ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসে এই দুই সংস্থা তাদের যৌথ বিবৃতিতে বলেছে দারিদ্র্যবৃদ্ধি এবং স্কুল বন্ধ হওয়ার মিলিত ফল হিসেবে শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাওয়াটা প্রায় অনিবার্য বলে ধরে নেয়া যায়। তারা এও জানায়, দারিদ্র্য এক শতাংশ বাড়লে শিশুশ্রম দশমিক ৭ শতাংশ বাড়ে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণায় প্রমাণিত। এ বিষয়ে এই জার্নালের ভিন্ন একটা প্রতিবেদনে আলোকপাত করেছি আমরা।

সারণী-৪: পোশাক শ্রমিকদের মাঝে কোভিড বিষয়ে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' পরিচালিত টেলিফোন জরিপের কিছু তথ্য (উত্তরদাতার সংখ্যা ৪৩০)

০% বলেছে	কোভিডকালে কেউ চিকিৎসকের কাছে যায়নি
৯৯.৮%-এর দাবি	তাদের কোভিড হয়নি
৮৫.৭% বলেছে	'ঐ সময়' তাদের জ্বর ও কাশি হয়েছিল
৯৯.৮% জানিয়েছে	মার্চ ও এপ্রিলে (কোভিড শুরুর প্রথম দুই মাস) বেতন পেয়েছে
৯১.৪৮% বলেছে	মার্চ ও এপ্রিলে বেতন পেলেও শ্রম আইন অনুযায়ী পুরো বেতন পাননি
৬৭.৪৪% জানান	কাজ হারানোর শঙ্কা করছেন তারা
৩১.৮% বলেন	কোভিড কালেও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন

সাক্ষাৎকার

'গাদাগাদি করে কাজ করলেও শ্রমিকদের মাঝে করোনার প্রকোপ সেরকম হয়নি'

- মোশরেফা মিশু, শ্রমিক নেত্রী
[এই টেলিফোন সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় অক্টোবর মাসে]

গার্মেন্ট খাতে করোনাকালে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের যেসব খবর প্রকাশিত হচ্ছে– সেগুলো সম্পর্কে আপনারা কতটা ওয়াকিবহাল? আপনাদের সংগঠনসূত্রে আপনারা কী খবর পাচ্ছেন? এসব ছাঁটাইয়ের সত্যতা কতটুকু?

পেপারে যা আসছে বা এসেছে সেটা শতভাগ সত্য। পোশাক খাতের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোতে– অর্থাৎ সাভার, নারায়ণগঞ্জ, আশুলিয়া সর্বত্র করোনার কালে এবং করোনার অজুহাতে অনেক ছাঁটাই হয়েছে।

কারখানা বন্ধ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আপনাদের কাছে কিরূপ তথ্য আসছে?

মালিকরা বলছেন বটে অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এসব দাবির পূর্ণাঙ্গ সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। যদিও এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত তথ্য দিতে পারবো না এখন।

শ্রমিকরা করোনার মাঝে কতটা আক্রান্ত হলো? এ বিষয়ে কোন হিসাব আছে আপনাদের?

এটা এক বিস্ময়ের দিক যে, গাদাগাদি করে কাজ করলেও শ্রমিকদের মাঝে করোনার প্রকোপ সেরকম হয়নি– যেরকমভাবে হতে পারতো। সাভার অঞ্চলে কেবল বেশ কিছু শ্রমিক আক্রান্ত হয়েছে।

মহামারিকালে বেতন বোনাসে অনিয়মের কোন ঘটনা ঘটেছে?

ঈদের সময় বোনাসে অনিয়ম হয়েছে। সবাই পূর্ণ বোনাস পায়নি। অনেক স্থানে বেতনও কম দেয়া হয়েছিল।

-

শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকারের বাস্তব অবস্থা

বিদ্যমান নিয়ম-নীতি মেনে দেশের নাগরিকদের সংঘ গঠনের অধিকার দিয়েছে বাংলাদেশ সংবিধান। কিন্তু সেই অধিকারের বাস্তবায়নে রয়েছে অনেক প্রতিবন্ধকতা। এ বিষয়ে অনুসন্ধানে যেয়ে শ্রম অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট সূত্রে জানা যায়, শ্রম অধিদপ্তর থেকে সর্বশেষ ৮৩৪২টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং এসব ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ২৮,৪১,৯৮৮ জন বলে দাবি করা হয়েছে।

২০১৯ সালে মোট রেজিস্ট্রেশনের আবেদনের সংখ্যা ছিল ১০৩৪টি। এর মধ্যে নিষ্পন্ন করা হয়েছে ৯১৫টি। নিষ্পন্নকৃত দরখাস্তের মধ্যে ৪২৪টি রেজিস্ট্রেশন, ৩৬০টি নথিজাত (পোশাক শিল্প) এবং ১৪৭টি (পোশাক শিল্প) প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন প্রদানের হার ৪৬ শতাংশ।

তবে একই সঙ্গে, অধিদপ্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানিয়েছে দেশে বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা মোট কলকারখানার তুলনায় ৪-৫ শতাংশ হতে পারে।

সারণী-৫: ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন: আবেদন ও অনুমোদনের চিত্র ২০১৯

আবেদন করে	রেজিস্ট্রেশন পায়
১০৩৪	৪২৪টি (৪৬ শতাংশ)

কারখানার তুলনায় ইউনিয়ন সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে ঐ সূত্র থেকে বলা হয়, 'ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদানের বিষয়টিকে একটি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। দেশের মালিকদের ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়ে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। কারণ অতীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যার ফলে তাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে তাদের পজিটিভ ধারণা গড়ে উঠেনি। সেজন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিককর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলেই মালিককর্তৃক এক ধরনের বাধার সম্মুক্ষীন হতে হয়। এ প্রক্রিয়া থেকে উত্তোরনের জন্য মালিক এবং শ্রমিক উভয় পক্ষেরেই অনেক করণীয় রয়েছে। এ ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক সংলাপসহ প্রশিক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখ্য, শ্রম অধিদপ্তরের নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার প্রাথমিক শর্তগুলো হলো: নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সদস্য সংগ্রহ, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও অনুমোদন, কার্যনির্বাহি কমিটি গঠন এবং বিধি মোতাবেক রেজিস্ট্রেশনের জন্য শ্রমদপ্তরের আবেদনের নিমিত্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ক্ষমতা প্রদান করা। এছাড়া আবেদনের সাথে শ্রম আইনে উল্লেখিত রেকর্ডপত্র– যেমন, সাধারণ সভার নোটিশ, সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, সদস্য তালিকা, কর্মকর্তাদের তালিকা, গঠনতন্ত্র ইত্যাদি দিয়ে আবেদন করতে হয়।

যদিও বাংলাদেশে কলকারখানার তুলনায় ইউনিয়নের সংখ্যা কম কিন্তু স্বাধীনতার পরপর শ্রমজীবীদের অধিকার দেশটিতে গুরুত্ব পাচ্ছিলো। ১৯৭২ সালের ২২ জুন আইএলওতে সদস্য হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যে একই দিনে আইএলও'র ২৯টি শ্রমমান (কনভেনশন) অনুসমর্থন করে। বর্তমানে বাংলাদেশ আইএলওর ১৯০টি কনভেনশনের মধ্যে ৩৫টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। ৮টি কোর কনভেনশনের মধ্যে ৭টি কোর কনভেনশন বাংলাদেশকর্তৃক অনুসমর্থিত হয়েছে। এখানে কনভেনশনগত ও আইনগত ভিত্তির ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি নেই। ঘাটতি হলো মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে। এই বোঝাপড়া অর্থাৎ দূরত্ব যতটা কমিয়ে আনা যাবে ততই ট্রেড ইউনিয়নের হার বৃদ্ধি পাবে। কল-কারখানা শ্রমিকদের সংঘ গঠন ও কথা বলার অধিকার আন্তর্জাতিকভাবেও এখন ক্রেতাসমাজের বড় এক চাওয়া হয়ে উঠেছে।

মহামারিতে লাখ লাখ গৃহশ্রমিক বেকার ও ঋণগ্রস্ত হলো

২০২০ সালের মহামারিকালে বাংলাদেশের শ্রমখাতের সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী শহুরে গৃহশ্রমিকরা। বিশেষ করে যেসব গৃহশ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করতেন 'মালিক'রা তাৎক্ষণিকভাবে বাদ দিয়ে দেয় তাদের। আবার স্থায়ীভাবে কাজ করা গৃহশ্রমিকরাও যারা ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছে তাদের কমসংখ্যককেই কাজে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। কারো ভাইরাস সংক্রমণ হয়েছে কি হয়নি সেটা দেখা হয়নি।

মালিকরা বছরের পর বছর এই শ্রমজীবীদের সেবা নিলেও ভাইরাস পরীক্ষা করে চাকুরিচ্যুতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো ধৈর্য্য দেখাননি। গণহারে সকল অস্থায়ী গৃহশ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। ন্যাশনাল ডমেসটিক ওমেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামের একটা সংগঠন দাবি করেছে লকডাউন ঘোষণার ফলে করোনাকালে মার্চ পরবর্তী সময়ে খুবই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় ১২ লাখ গৃহশ্রমিক কাজ হারিয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ বলেছে, করোনায় ৫৭ ভাগ গৃহশ্রমিক কাজ হারিয়েছে এবং বাকি ৪৩ ভাগের বেতন কমে গেছে। জুনের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় প্রায় তিন হাজার গৃহশ্রমিকের মাঝে জরিপ চালিয়ে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। নারীমৈত্রী নামের একটি সংগঠনের পরিচালক শাহীন আক্তার ডলি করোনার সময় এক অনলাইন সেমিনারে তাঁদের এপ্রিল মাসের অনুসন্ধানে ৮৫ ভাগ গৃহশ্রমিক কাজ হারিয়েছেন বলে জানান। শাহীন আক্তার ডলি বলেন, তাঁদের অনুসন্ধানে দেখেছেন 'গৃহশ্রমিকদের ৮০ শতাংশের রয়েছে শিশুসন্তান, ৩০ শতাংশের বাসায় রয়েছেন বয়স্ক মানুষ। ফলে করোনা তাদের জন্য সর্বনাশা এক অবস্থা তৈরি করেছে।'

কাজ হারানো মাত্রই দরিদ্র এই শ্রমজীবীরা প্রথমেই বাসাভাড়া না দিতে পারার সংকটে পড়েন। অনেককেই কাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সময় মালিকরা বাড়তি কোন অর্থ দেননি। এরকম শ্রমিক পরিবারগুলো খাবার খরচ যোগানো, চিকিৎসা ব্যায় মেটানোসহ নানান প্রয়োজন অনেকেই টাকা ধার করেছে। এই ধার নিয়েছে তাঁরা উচ্চসুদে। করোনার মহাদুর্যোগ থিতিয়ে এলেও লাখ লাখ গৃহশ্রমিকের বড় অংশের এই দুর্দশা এখনও শেষ হয়নি।

সারণী-৫: বাংলাদেশ গৃহশ্রমিক চিত্র
দেশে গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (আনুমানিক) ৩০ থেকে ৪০ লাখ
ঢাকায় গৃহশ্রমিকের সংখ্যা (আনুমানিক) ১৭ লাখ
গৃহশ্রমিকদের মাঝে ৬০ ভাগই অস্থায়ী শ্রমজীবী

গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য আইএলও কনভেনশন ১৮৯-এর অনুসমর্থন ও বাস্তবায়ন জরুরি।

- সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

খাদ্য ও বাসস্থানের সংকটের পাশাপাশি করোনার দুর্যোগে গৃহশ্রমিকরা পরিবারের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে চরম মানসিক চাপেরও শিকার। অনেকেই মানসিক সেই সংকট থেকে এখনও স্বাভাবিক হতে পারেননি। সেইফটি এণ্ড রাইটস- এর মতো কিছু সংগঠন এই শ্রমিকদের জন্য কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। এরকম শ্রমিকদের কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তির মতো কাজেও লিপ্ত হয়েছে নিকটজনকে বাঁচাতে।

প্রচারমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে দেখা গেছে, গৃহশ্রমিকদের অনেক পরিবার দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। নগর অঞ্চলের স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকার– কোন তরফ থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে এই গৃহশ্রমিকদের সংকট থেকে বাঁচাতে তখন কেউ এগিয়ে আসেনি। এই না আসার একটা অজুহাত হিসেবে বলা হয় অস্থায়ী গৃহশ্রমিকদের অনেকের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই।

আইএলও সনদ ১৮৯-এর বাস্তবায়ন কোথায়?

বাংলাদেশের শ্রমখাতগুলোর মাঝে মজুরির বিনিময়ে গৃহকর্ম সবচেয়ে বেশি নারীময়। বিপুল সংখ্যায় মেয়েশিশুও এই পেশায় রয়েছে। তবে দেশে কী পরিমাণ গৃহশ্রমিক আছে সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য উপাত্ত নেই। আইএলও'র ২০০৬ সালের একটা প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় দেশে প্রায় ৪০ লাখ গৃহশ্রমিক রয়েছে। এই পরিসংখ্যান পুরোপুরি নির্ভুল নয় বলেই মনে করা হয়। গৃহশ্রমিকদের প্রকৃত সংখ্যা কমবেশি হতে পারে। এ সংখ্যা ৩০ লাখ বলেও দাবি করা হয়। যার মধ্যে ১৭ লাখের অবস্থান ঢাকায়। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করে থাকে।

করোনাকালে দেশের গৃহশ্রমিকদের এই সংকটের মাঝেই বিদেশে কাজ করা গৃহশ্রমিকরাও অনেকে চাকুরি হারিয়ে দেশে ফিরেছেন। কিন্তু বিদেশে কাজ করা বাংলাদেশীদের পক্ষে কথা বলতে হলে এখানকার সরকারকে আগে নিজ দেশে কাজ করা গৃহশ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নে মনযোগী হওয়ার দায় রয়েছে। কিন্তু গৃহশ্রমিকদের পেশাগত স্বার্থ দেখার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার যে সনদ রয়েছে তার সুরক্ষা বাংলাদেশের গৃহশ্রমিকরা পায় না বললেই চলে। কারণ বাংলাদেশ তাতে স্বাক্ষরই করেনি। এসব বিষয়ে সামাজিক পরিসরে কোন সচেতনতামূলক কার্যক্রমও নেই। গৃহশ্রমিকরাও যে এক ধরনের 'শ্রমিক' এবং তাদেরও যে শ্রম বিষয়ক কিছু অধিকার থাকতে পারে এ বিষয়ে তাদের কাজদাতাদের মাঝে উপলব্ধি অতি সামান্য। সব মিলে এই খাতে এক আদিম অবস্থা বিরাজ করছে বলা যায়। বিদ্যমান শ্রম আইনের আওতা থেকেও তাদের বহির্ভূত রাখা হয়েছে।

স্থানীয়ভাবে প্রায় পাঁচ বছর আগে গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণে যে নীতিমালা তৈরি করা হয়েছিল সেটাও আইনে প্রণীত হয়নি আজও। এই নীতিমালায় গৃহশ্রমিকদের নথিভুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তার কোন বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায় না।

উপরন্তু এখনও গৃহশ্রমিকদের মজুরির কোন নির্ধারিত কাঠামো নেই দেশে। সাধারণ পর্যবেক্ষণে যা দেখা যায় সর্বনিম্ন ৩-৪ হাজার থেকে ৮-১০ হাজার টাকা পর্যন্ত মজুরি পেয়ে থাকে এই শ্রমিকরা। তবে তাদের চাকুরির কোন নিশ্চয়তা নেই। পরিচয়পত্র নেই। সাপ্তাহিক ছুটিও অতি বিরল। এ ছাড়া প্রতিকারহীন শারীরিক-মানসিক নিপীড়নের ঘটনাও প্রচারমাধ্যমে আসে প্রায়ই। মহামারির কারণে গৃহশ্রমিকদের পূর্বতন মজুরি চিত্র আবারও এক দফা খারাপ হলো। যেহেতু বেকারের সংখ্যা বেড়েছে সেকারণে তাদের মজুরি নিয়ে দরকষাকষির ক্ষমতাও কমে গেছে। অথচ এখাতের এই মানুষরা সরকারের মহামারিকালীন আর্থিক সহায়তা থেকেও গোষ্ঠীগতভাবে বঞ্চিত থেকে গেছে। পোশাক তৈরিসহ অনেক খাতে লকডাউনের মাঝেও শ্রমিকদের বেতনভাতা দিতে সরকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। গৃহশ্রমিকরা সেরকম কোন সুবিধাও পায়নি। গৃহশ্রমিক নীতিমালায় তাৎক্ষণিকভাবে কাজ ছাড়ানো হলে এ ধরনের শ্রমিককে অন্তত এক মাসের আগাম মজুরি দেয়ার যে সুপারিশ ছিল সেটার বাস্তবায়ন বিষয়েও সরকারি তরফ থেকে করোনাকালে কোন দিক নির্দেশনা ছিল না।

এ খাতের শ্রমিক সংগঠকরা অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও গৃহশ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এই নীতিমালাকে আইনে পরিণত করার দাবি জানিয়েছেন বারংবার।

-

করোনায় চামড়া খাতে ছাঁটাইয়ে বাড়তি গতি

চামড়া খাত ঢাকার হাজারিবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় ২০১৭ সাল থেকে ছাঁটাই চলছিল। এবার করোনাকালে তাতে নতুন তরঙ্গ তৈরি হয়েছে। জানালেন এই খাতের শ্রমিক নেতা আবুল কালাম আজাদ।

চামড়াশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রফতানিমুখী শিল্পখাত। কাঁচা চামড়া সংগ্রহ থেকে শুরু করে জুতা জ্যাকেট ব্যাগ তৈরি ও বিপণন পর্যন্ত প্রায় ৫০ লাখ মানুষ এই খাতে যুক্ত। তবে অনেক পুরানো শিল্প হলেও এই খাতের আয়তন প্রত্যাশা অনুযায়ী বাড়েনি বরং ধীরলয়ে সংকুচিত হচ্ছে। সরকারি দিক থেকে কিছু উদ্যোগের পরও এই খাতের পরিসর বাড়ছে না। বরং মহামারির সময় উৎপাদন কমে যাওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই এবং কারখানা বন্ধের ঘটনা বেড়ে গেছে। এর বড় কারণ হিসেবে মালিকরা বলছেন, ইউরোপের বাজারে চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া এবং চীনের সঙ্গে যোগাযোগ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা। চীনের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ থাকায় অনেক চামড়া অবিক্রিত থেকেছে। প্রয়োজনীয় কেমিক্যালের সরবরাহও বিঘ্নিত হয়েছে। ঠিক একই কারণে উৎপাদান ও রফতানিও প্রত্যাশা মতো করা যায়নি। এভাবে একদিকে প্রক্রিয়াজাতকরণের রাসায়নিক না থাকা এবং নতুন করে পণ্যের সরবরাহ-আদেশ না থাকায় অনেক কারখানা ছাঁটাই প্রক্রিয়া বাড়িয়েছে। তবে এটা ছিল এই খাতে পূর্ব থেকে সৃষ্ট সংকটের একরূপ জের।

এই খাতের চলতি সংকটের আরেক প্রতিক্রিয়া ঘটেছে কাঁচা চামড়ার দাম কমে যাওয়ার মধ্যদিয়ে। এভাবে সবমিলে পুরো বছরটি চামড়া খাতের জন্য নেতিবাচক ছিল। পরপর দু'বছর ঈদুল আজহায় চামড়ার দাম ছিল ভয়াবহভাবে নিম্নমুখী। সর্বশেষ ঈদে করোনার অজুহাতে অনেকেই চামড়া ক্রয়ে অনীহা দেখিয়েছে। যা এই শিল্পের কাঁচামালের ভবিষ্যত সরবরাহ নিয়ে শঙ্কা তৈরি করে রেখেছে। চামড়া ক্রয়-বিক্রয়ে যুক্ত থাকা অনেকে এভাবেও কর্মহীন হয়েছে এবং হচ্ছে। ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, নাটোর, গাইবান্ধার পলাশবাড়ি, রংপুরসহ বিভাগীয় মূল শহরে চামড়া সংগ্রহের আড়ত রয়েছে। এসব আড়ত ঢাকায় ট্যানারি মালিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে এতদিন ব্যবসা করে আসছে।

সারা বছর মাংসের জন্য দেশে প্রায় দুই কোটি প্রাণী জবাই করা হয়। এর মাঝে এক কোটি পশুর চামড়া সংগৃহীত হয়। এর বড় এক অংশ ঘটে ঈদুল আজহার সময়। অতীতে কোরবাণীর পশু থেকে পাওয়া কাঁচাচামড়ার বড় অংশই ট্যানারিগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতো।

২০২০ এ সরকার এ খাতের ব্যবসায়ীদের মাত্র ২ শতাংশ টাকা দিয়ে ঋণ পুনঃতফসিল করারও সুযোগ দেয়। চামড়া খাতে ইতোমধ্যে বিতরণ হওয়া ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা বলে প্রচারমাধ্যম সূত্রে জানা যায়। এর মাঝে খেলাপিই সোয়া তিন হাজার কোটি টাকা।

শিল্পের স্থানান্তর থেকে সংকটের শুরু

বহু উৎসাহ উদ্দীপনার পরও সাভারে শিল্প নগরী গড়ার পরও কেন চামড়াখাতে প্রত্যাশিত অগ্রগতি ঘটছে না এর একটা উত্তর হলো এখানে শিল্প স্থাপনের ১৫৫টি অনুমতির মাঝে এমন অনেকে রয়েছে যারা এই খাতের ব্যবসার ধরনে হালনাগাদ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ নন। প্লট পেলেও তাঁরা সেখানে কারখানা করেননি। এছাড়া এখানে অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো, কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ ইটিপি স্থাপন নিয়ে অব্যবস্থাপনাও ব্যবসার জন্য খারাপ ফল দিয়েছে। সকল ধরনের বর্জ্য পরিশোধন করার উপযুক্ত একটা কেন্দ্রীয় ইটিপি এখনও করা যায়নি এই শিল্প নগরীতে। বাংলাদেশের চামড়া পণ্যে বিদেশী অনীহার এটা এক বড় কারণ। চামড়ায় বর্জ্য ফেলার জন্য যে ডাম্পিং ইয়ার্ড দরকার সেটাও যথোপযুক্তভাবে তৈরি হয়নি সাভারের চামড়া শিল্প নগরীতে। পুরো খাতের টেকসই বিকাশের জন্য এসব অত্যাবশ্যক ছিল। ফল হিসেবে দেখা যায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছর প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি হলেও পরের বছর তা ৮ শ' মিলিয়ন ডলারের নীচে চলে আসে। আর ২০২০ এ এটা আরও কমবে বলে অনুমান চলছিল। এখাতের বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের হিস্যা এখনও সামান্য। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বিশ্ব বাজার প্রায় ২ হাজার কোটি ডলারের । বাংলাদেশ তার বিশভাগের এক ভাগ মতো হিস্যাধারী।

-

সাক্ষাৎকার

'কয়েক বছরে চামড়া খাতের ত্রিশ ভাগ শ্রমিক ছাঁটাই

- আবুল কালাম আজাদ, শ্রমিক নেতা

আমরা শুনেছি করোনার সময় ট্রেড ইউনিয়ন কাজে সক্রিয় থাকাকালেই আপনি অসুস্থ হয়েছিলেন। এখন কেমন আছেন?

আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। আমার চিকিৎসা করতে যেয়ে আমার চিকিৎসক মেয়েও আক্রান্ত হয়েছিল। উভয়ে আমরা সুস্থ হয়েছি।

আপনি যেখাতের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের চেষ্টায় জীবন কাটালেন সেই খাতের শ্রমিকদের মাঝে মহামারি কতটা ছড়ালো?

শ্রমিকরা গরীব মানুষ। তারা এটাকে পজিটিভ-নেগেটিভ হিসেবে দেখে নি বা আমাদের সেভাবে জানায়ওনি। আমরা জেনেছি অনেক শ্রমিকের জ্বর, কাশি এসব হয়েছে। কেউ কেউ ৪-৫ দিন তখন ছুটিতে ছিল। আবার কাজে ঢুকে পড়েছে। এরকম সংখ্যাই বেশি। তবে করোনায় ২-৩ জন ট্যানারি মালিক মারা গেছেন।

মহামারিজনিত স্বাস্থ্যগত বা অর্থনৈতিক কারণে কোন কারাখানা বন্ধ হয়েছে কী?

এ ব্যাপারটি স্থানান্তরের পটভূমিতে বুঝতে হবে। ঢাকা থেকে সাভারে পুরো শিল্প স্থানান্তরের পর অনেক কারখানা চালুই হয়নি আর। কেউ কেউ ভবন তৈরি করেছে কিন্তু কাজ শুরু করেনি। আবার যারা চালু ছিল করোনার সময় তারা অনেকে উৎপাদন সীমিত করেছে। কিছু কারখানা কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল। কিছু কারখানা পুরোদমেই চলেছে। তবে ২-৩ বছরের হিসাবে এবং হাজারিবাগের কারখানার হিসাবে কিছু কারখানা পুরোদমেই বন্ধ।

এই খাতের এই বিপন্নতা কেন? আপনাদের বিবেচনা কী বলছে?

এটা যে ঘটবে আমরা আগে থেকেই বলছিলাম। বাজার ছোট হওয়ার দায় দিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই সহজ। অথচ খাতের উন্নয়ন ঘটানো হয়নি। এই শিল্পের বড় সমস্যা উদ্যোক্তারা কমপ্লায়েন্সের উপর গুরুত্ব দেয়নি। ইটিপির উপর গুরুত্ব দেয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পিছিয়ে পড়ছে। একালে উৎপাদন ও বিপননে পরিবেশসম্মত হওয়া এক বড় চাহিদা। মালিকরা সেসব বিষয়ে মনোযোগী নন। তারা সংকট সামাল দিতে চান কেবল শ্রমিক ছাঁটাই করে। এতে ক্রমে ব্যবসা খারাপই হয়েছে।

আপনাকে যদি সংখ্যার হিসাব অনুমান করতে বলি তাহলে করোনাকালে চামড়া খাতে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের সংখ্যা কত হবে?

গত কয়েকবছর মিলে এই খাতের ৩০ ভাগ শ্রমিকই ছাঁটাই হয়ে গেছে। করোনার আগের অবস্থাসহ এই সংখ্যা তিন হাজার হবে। করোনাকালেও প্রায় তিন-চার শ শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। মালিকদের এক কথা– ব্যবসা খারাপ।

আপনিও স্বীকার করেছেন ব্যবসা খারাপ!

দেখুন, যাদের ছাঁটাই করা হচ্ছে তারা অধিকাংশ সিনিয়র কর্মী। অর্থাৎ দীর্ঘদিন কাজের পর এদের বেতন ভাতা একটু বেশি। আর এরা ইউনিয়নেরও গুরুত্বপূর্ণ কর্মী। এদেরই টার্গেট করে ছাঁটাই করা হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে পুরানো কর্মী ছাঁটাই করে কম বেতনে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ এবং অন্যদিকে ইউনিয়নকে ক্রমে দুর্বল করে দেয়াই চলমান ছাঁটাই প্রক্রিয়ার মূল অন্তর্নিহিত লক্ষ্য।

আপনারা, মানে ইউনিয়ন এসব বিষয়ে কী করছে?

করোনার সময়ে সবাই জমায়েত হয়ে কিছু করা কঠিন ছিল। তারপরও আমরা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দিয়েছি। সংকটের কথাগুলো বলেছি। আমাদের এসব তৎপরতার ফলে একটা বিষয় হয়েছে– ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত যারাই ছাঁটাই হচ্ছে তাদের অধিকাংশ বেনিফিট পাচ্ছে। তাদের পাওনা আদায়ে আমাদের ভূমিকা থাকছে।

-

কাজের বিজ্ঞাপন কমে গেছে: বিপুল বেকারত্ব

কোটি কোটি মানুষের শ্রেণী অবস্থান পাল্টাচ্ছে

২০২০ এর ২৫ জুন বার্তা সংস্থা ইউএনবি বিআইডিএস-এর গবেষণা তথ্য প্রকাশ করে জানিয়েছিল মহামারির আঘাতে দেশের ১৩ শতাংশ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। বর্তমান সংকলনের পূর্ববর্তী এক প্রতিবেদনে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে। তবে পরের মাসে (জুলাই) গবেষণাসংস্থা 'সানেম' (সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং) আরও সুনির্দিষ্টভাবে জানায়, ২০২০ সালে করোনাসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকটে সবমিলে দেশে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ কর্মহীন। এই কর্মহীনতা তৈরি হয়েছে মহামারির ফলে দেশেবিদেশে কম ভোগ কম উৎপাদন ও কম আয়ের চক্র তৈরি হওয়ায়। বিনিয়োগ স্থবিরতা এবং সাপ্লাইচেইনের ভঙ্গুরতাও বেকারত্ব বাড়ার এক বড় কারণ। এই বেকারদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পূর্ণকালীন ও স্বল্পকালীন কাজের কর্মীরা। সানেমের গবেষণায় ('কোভিড-১৯ এবং বাংলাদেশের শ্রমবাজারের সামনে চ্যালেঞ্জ') আরও বলা হয়, কর্মহীনতার ৫০ ভাগ ঘটেছে কুটির শিল্পে, ২৫ ভাগ ক্ষুদ্রশিল্পে, ২০ ভাগ মধ্য ও বড় শিল্পে এবং বাকি ৫ ভাগ অন্যান্য খাতে। যদিও ক্ষতিপূরণের মনোযোগ বেশি পেয়েছে বড় শিল্প।

উল্লেখ্য কোভিড-১৯ এর আগে থেকে বাংলাদেশে বেকারত্বের উচ্চহার বজায় ছিল। এদিকে মহামারিতে বছরের শেষ নাগাদ কত মানুষ আংশিক বা পূর্ণকালীন বেকার হয়েছে সে সম্পর্কে দেশে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত না পাওয়ার বিষয়ও এ সময় সংবাদমাধ্যমে বড় আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। পলিসি রিসার্চ ইনসটিটিউটের নির্বাহি পরিচালক আহসান এইচ মনসুর ১৮ জুলাই ঢাকা ট্রিবিউনকে বলেন, দেশের শ্রমবাজার সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়া অর্থনীতির বিশ্লেষণে বড় বাধা।

উল্লেখ্য, আইএলও জানিয়েছে মহামারির কারণে বিশ্বে বাংলাদেশ বিশেষভাবে বিপদের মুখে। কারণ এখানে শ্রমখাত বেশি মাত্রায় অনানুষ্ঠানিক ধরনের। আত্মকর্মসংস্থান এবং দৈনিক মজুরির শ্রমিকই বাংলাদেশে বেশি। স্বল্প আয়ের এই শ্রমজীবীরা মহামারিকালে অনেক দিন কর্মহীন ছিল এবং বড় এক অংশ এখনও কাজের অভাবে আছে।

মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সদ্যবিদায়ী বছরের মাঝামাঝি কয়েক মাস বেকারত্বের চূড়ান্ত আক্রমণ ঘটেছিল পরিবহন খাতে। সড়ক ও নৌ পরিবহনে লাখ লাখ শ্রমিক এ সময় বেকার হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ যাত্রীকল্যাণ সমিতির হিসাবে সড়ক পরিবহন খাতে এসময় ৭০ লাখ এবং নৌ পরিবহন খাতে প্রায় ২০ লাখ মানুষ বিভিন্ন পর্যায়ে কাজহীন সময় কাটায়।

অন্যদিকে দীর্ঘসময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নেও দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বছর

শেষেও চাকুরির বিজ্ঞাপন তেমন চোখে পড়ছে না। বরং অনেক প্রতিষ্ঠানই নীরবে কর্মী ছাঁটাই করছে বা কর্মীদের বেতন কমিয়ে দিয়েছে। এতে তরুণরা কেবল হতাশই নয়– পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে এতে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অনেক পরিবারেই উপার্জনকারী ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে পড়ার মুখে তরুণদের পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু আয়ের সুযোগ না থাকায় তারা এই পরিস্থিতিতে অসহায় বোধ করছে।

বাংলাদেশে এমনিতে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ-তরুণী শ্রমবাজারে প্রবেশের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ২০২০ সালে করোনার কারণে চাকুরিবিহীন বাজারে ঐ সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে উঠেছে।

২০২০-এর জুনে বিবিসি আইএলও'র বরাতে উল্লেখ করে, করোনা সংকটকালে বিশ্বে প্রতি ছয়জন কর্মক্ষম মানুষের একজন বেকার হয়ে পড়েছে। আর বাংলাদেশে প্রতি চার জন যুবকের একজন কর্মহীন হয়েছে (২৭.৩৯ শতাংশ)। ২০২০-এর ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন করে কর্মহীনতার তরঙ্গ শুরু। আইএলও সাধারণত সপ্তাহে এক ঘন্টা কাজ না পাওয়া মানুষকে বেকার বলে। সেই হিসাবে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে বেকার ছিল ২৭ লাখ মানুষ। যদিও এই সংখ্যা বাস্তবে এবং স্থানীয় অনেক সংস্থার হিসাবে অনেক বেশি বলে অনুমান করা হয়।

বিডিজবসের নির্বাহি পরিচালক একেএম ফাহিম মাশরুর জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারি থেকে চাকুরির বিজ্ঞাপন কমে গেছে। যেসব চাকুরির বিজ্ঞাপন আসছে সেখানে অভিজ্ঞ লোক চাওয়া হচ্ছে। নতুন গ্রাজুয়েটদের চাহিদা অনেক কমে গেছে। তবে বিদায়ী বছরে কত লোক কাজ হারালো এবং কোন শ্রেণীর মানুষ বেশি কর্মহীন এ বিষয়ে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য পর্যাপ্ত কোন তথ্যভান্ডার নেই।

মাশরুর বিবিসিকে জানান, 'বড় প্রতিষ্ঠানগুলো হয়তো লোক ছাঁটাই করছে না, কিন্তু ছোট বা মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু অনেক কর্মী ছাঁটাই করেছে। ডেভেলপমেন্ট সেক্টর, এনজিও বা ই-কমার্স কোম্পানি ছাড়া আর কেউ এখন কর্মী নিয়োগ করছে না। নতুন কর্মী নেয়ার কথা ভাবছে না প্রতিষ্ঠানগুলো। ব্যাংক, বহুজাতিক বা বড় কোম্পানিগুলো কয়েকমাস ধরে 'ব্যবসা না হওয়া'য় কর্মী ছাঁটাই করছে বা বর্তমান কর্মীদের বেতন কমিয়ে দিয়েছে।

খেলাপি ঋণের চাপ, তারল্য সংকট– তার ওপর ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতির কারণে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ব্যাংকিং খাতে ও ব্যবসার আকার সংকুচিত হয়েছে। ব্যয় কমানো ছাড়া তাদের সামনে কোনো বিকল্প নেই। বেতন না কমালে ক্রমে ছাঁটাই করতে হবে।

করোনাভাইরাস মহামারি কবে শেষ হবে, তাও বছর শেষে এখনো সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। অনেকের আশঙ্কা, মহামারির কারণে আর্থিক মন্দা বহাল থাকবে আরো কিছুদিন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের প্রধান নির্বাহী ড. ফাহমিদা খাতুন বিবিসি বাংলাকে তাঁর মতামতে জানিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত অর্থনীতি ঠিক না হবে, ততদিন তরুণদের অনেকের শ্রমবাজারে প্রবেশ কঠিন হবে। 'এমনকি করোনা পরবর্তী সময়েও যেসব কাজের সৃষ্টি হবে, সেগুলোর ধরন অন্যরকম হবে। আগের গতানুগতিক শিক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়া যাবে না। বাজার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ, সেই সঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দরকার হবে।'

তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, যুবকদের এই সমস্যা ও সংকটের ব্যাপারে এখনি গুরুত্ব দেয়া উচিত। 'দীর্ঘদিন কর্মহীন থাকলে তাদের মধ্যে হতাশার জন্ম নেবে। এর সামাজিক একটা প্রভাব তৈরি করবে। যে ক্ষতি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে না। সমাজের ওপরেও নেতিবাচক একটা প্রভাব পড়বে।

এদিকে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে নাজুক করার পাশাপাশি দেশে একই সময়ে আয়-ভোগ এবং সম্পদ বৈষম্যও বাড়িয়েছে বড় মাপে। যার প্রধান এক শিকার শ্রমজীবীরা।

'বিপজ্জনক আয়বৈষম্যের দেশ'

৮ জুন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সরকার ঘোষিত ৬৬ দিনের লকডাউনে বাংলাদেশে ৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ কর্মহীন হয় এবং ২ কোটি ৫৫ লাখ মানুষ হতদরিদ্র হয়েছে। অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. আবুল বারকাত এক সেমিনারে অংশ নিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, করোনা ভাইরাসের আগে দেশে কাজে নিয়োজিত মানুষ ছিল ৬ কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যেই উপরোক্ত সংখ্যক মানুষ কাজ হারিয়েছে।

ড. আবুল বারকাত এই অবস্থায় বাংলাদেশকে বলেছেন উচ্চ *আয়বৈষম্যের দেশ বা বিপজ্জনক আয়বৈষম্যের দেশ*। তাঁর ভাষায়, মার্চ থেকে শুরু হওয়া লকডাউনের আগে যে এক কোটি ৭০ লাখ মানুষ অতি ধনীর শ্রেণীতে ছিল মহামারিতে তাদের অবস্থার তেমন পরিবর্তন ঘটায় নি। ফলে করোনা পরবর্তী সমাজে সম্পদ বৈষম্য, ভোগ বৈষম্য ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। উচ্চ মধ্যবিত্তদের অন্তত এক কোটি মধ্য-মধ্যবিত্তের কাতারে নেমেছে; আর মধ্য-মধ্যবিত্তে থাকা তিন কোটি ৪০ লাখ থেকে আরো প্রায় এক কোটি নিম্ন-মধ্যবিত্তের কাতারে নেমে গেছে। একই সময়ে নিম্ন মধ্যবিত্তের শ্রেণী অবস্থানে থাকা প্রায় পাঁচ কোটির অন্তত এক কোটি ১৯ লাখ দরিদ্র হয়ে গেছে। আর দরিদ্র তিন কোটি ৪০ লাখের অন্তত দুই কোটি ৫৫ লাখ হতদরিদ্র হয়েছে। সব মিলে কেবল লকডাউনের দিনগুলোতেই প্রায় ছয় কোটি মানুষের শ্রেণী অবস্থান পাল্টে গেছে।

উল্লেখ্য, করোনা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বিত্তবানদের উপর নতুন করে কর আরোপের সুপারিশ করেছিল।

-

মহামারিকালে শ্রেণীগত ওলোটপালোট যেভাবে:
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তথ্য

"লকডাউনের আগে অতি ধনী যে এক কোটি ৭০ লাখ মানুষ ছিল তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। তবে উচ্চ-মধ্যবিত্তে থাকা তিন কোটি ৪০ লাখ থেকে এক কোটি ১৯ লাখ মধ্য-মধ্যবিত্তে নেমে গেছে।

মধ্য-মধ্যবিত্তে থাকা তিন কোটি ৪০ লাখ থেকে এক কোটি দুই লাখ নিম্ন-মধ্যবিত্তে নেমেছে।

নিম্ন-মধ্যবিত্তে থাকা পাঁচ কোটি ১০ লাখ থেকে এক কোটি ১৯ লাখ দরিদ্র হয়েছে।

দরিদ্র থাকা তিন কোটি ৪০ লাখ থেকে দুই কোটি ৫৫ লাখ হতদরিদ্র হয়েছে।

সব মিলিয়ে লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনে পাঁচ কোটি ৯৫ লাখ মানুষের শ্রেণি কাঠামো পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ এ মানুষগুলোর প্রত্যেকের অবস্থান এক ধাপ নিচে নেমে গেছে।"

করোনায় বহুমাত্রিক সংকটে প্রবাসী শ্রমিকরা

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) সূত্রে যে আনুমানিক হিসাব পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকেন বলে প্রচারিত রয়েছে। প্রবাসী এই কর্মজীবী-শ্রমজীবীরা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে বড় এক ভরসা। প্রতি মাসে এই ভরসা শক্তিশালী হচ্ছে।

২০১৯-২০ এ প্রবাসী শ্রমিকদের সূত্রে প্রায় ১৮ শত কোটি ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ। আগের বছরের চেয়ে যা প্রায় আড়াই শ' কোটি ডলার বেশি। ২০২০ এর মাঝামাঝি করোনাকালে এই আয় কিছুটা কমে গিয়েছিল। করোনার প্রকোপ কমামাত্র সেটা স্বাভাবিক গতি পেয়েছে আবার। এমনকি এক পর্যায়ে বৈদেশিক মুদ্রা আসার পরিমাণ পুরানো সকল রেকর্ডও ভাঙ্গে।

কিন্তু ২০২০ সালে প্রবাসী কর্মজীবীরা চরম এক বিব্রতকর, অস্বস্তিকর এবং বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়েছিলেন। যার রেশ এখনও বহমান। মার্চের মধ্যেই প্রায় দুই লাখ শ্রমিককে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেশে ফিরতে হয় বলে বিবিসি-বাংলার সূত্রে জানা যায় (৬ জুলাই ২০২০)। এই ধারা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল। অনেকে ফিরছেন চার্টার্ড করা ফ্লাইটেও। বছরের মাঝামাঝি সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ইত্যাদি দেশ থেকে বাড়তি কর্মহীনতার সতর্কবার্তাও এসেছে কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু সেই তুলনায় নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না।

প্রবাসীর বাড়িতে লালপতাকা

বাংলাদেশের শ্রমজীবীরা যেসব দেশে বেশি মাত্রায় থাকেন সেসব দেশে বাংলাদেশের আগেই করোনা আঘাত হেনেছিল। ফলে প্রবাসী শ্রমিকদের অনেকে যে বিপদগ্রস্ত হয়ে দেশে ফিরবেন সেটা অনুমানযোগ্য ছিল। কিন্তু সেই অনুমান অনুযায়ী যথাযথ প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ সময়মতো নেয়া যায়নি দেশে। ফলে যখন দলে দলে প্রবাসী শ্রমিক দেশে ফিরতে শুরু করে তাদের দু'চার জনের মাধ্যমে তখন দেশেও করোনা ছড়াতে শুরু করে। এতে তাৎক্ষণিকভাবে দেশে আতংক এবং প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতি বৈরি সামাজিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রশাসনও এসময় এমন ভূমিকা নেয়– যা প্রবাসী শ্রমজীবী পরিবারগুলোর জন্য বিব্রতকর হয়ে ওঠে। অনেক এলাকায় ফেরত আসা প্রবাসীদের বাড়িতে 'লাল পতাকা' (বিপদের স্মারক) উড়িয়ে সেগুলো চিহ্নিত করা শুরু হয়। তাদের উপর সামাজিক নজরদারি বাড়ানো হয়। এতে এ ধরনের পরিবারগুলো সামাজিক বয়কটের মুখে পড়ে। কোথাও কোথাও ভ্রাম্যমান আদালতকর্তৃক প্রবাস থেকে আসা মানুষরা কেউ কেউ হোম কোয়ারিন্টিনের নির্দেশনা লঙ্ঘনের জন্য বিচারের মুখেও পড়েন। এরকম অনেককেই করোনার জন্য দায়ী করে রীতিমতো খল চরিত্র হিসেবে সামাজিকভাবে চিহ্নিত করা শুরু হয়।

কর্মচ্যুত হয়ে হাজার হাজার প্রবাসী বিপদে পড়েন

ভাইরাস-মহামারির কারণে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে অর্থনীতিতে এক ধরনের রক্ষণশীল মনোভাব দেখা যাচ্ছে এ বছর। বিনিয়োগ হচ্ছে কম। কর্মচ্যুতি হচ্ছে বেশি। নতুন কাজের সুযোগ গড়ে উঠছে নগণ্য। আবার যাদের সাময়িক হিসাবে কাজ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল করোনার প্রকোপ কমা সত্ত্বেও তাদের কাজে ফেরত নেয়া হচ্ছে না প্রত্যাশা মতো। এভাবে অনেক শ্রমিক এক জটিল অবস্থার শিকার হয়েছেন সদ্য বিদায়ী বছরে। বিবিসির উপরে উল্লিখিত তারিখের প্রতিবেদনে এরকম এক শ্রমিক– ঢাকার দনিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা রাশেদুল হাসান রুমি জানান– গত তিন বছর ধরে সিঙ্গাপুরে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। সেখানকার কোম্পানির সাথে তাঁর আরও দুই বছর কাজের চুক্তি ছিল। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার পর গত ১১ মার্চ তাঁকে ছুটির কথা বলে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখন তাঁর ভিসার মেয়াদও শেষ হয়ে আসছে– অথচ লকডাউনের কারণে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়নি। তিনি আদৌ সিঙ্গাপুরে ফিরে গিয়ে কাজে যোগ দিতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আর কাজে ফিরতে না পারলে– বিদেশ যাওয়ার ঋণ কীভাবে শোধ করবেন, তাঁর আয়ের ওপর নির্ভরশীল সাত সদস্যের পরিবারকেইবা কিভাবে সামলাবেন এমন নানা দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরেছে তাঁকে। রুমি বলেন, 'অনেকের তো চাকরি চলে গেছে। আমাদের কাজের পারমিট বাতিল করে দিয়েছে। বলেছে 'করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কাটলে দেখা যাবে।' কোম্পানি নিতে চাইলে নিবে, না চাইলে নিবে না। কোন গ্যারান্টি নাই।'

অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা নিয়ে ২০১৬ সালের যে আন্তর্জাতিক বিধিমালা আছে সেখানে বলা হয়েছে, যেকোনো দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অভিবাসী শ্রমিকরা যে দেশে অবস্থান করবেন, তাদের দায়িত্ব সে দেশের ওপরই বর্তায়। এ অবস্থায় অভিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুটি উপায়ে সরকারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন প্রবাসীদের অধিকারের জন্য সক্রিয় বেসরকারি সংস্থা রামরুর চেয়ারম্যান তাসনিম সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাপী তেলের দাম পড়ে যাওয়ায়, এই শ্রমিকরা পুনরায় কবে বিদেশ যেতে পারবেন, সেটা বলা যাচ্ছে না। ওই দেশ-গুলোয় সব কিছু স্বাভাবিক হতে আরও সময় লাগবে। এখানে সরকারকে অভিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।'

ফিরে আসা মানুষদের কী হবে

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় দুই লাখ মানুষ করোনার সময় এবং আগে-পরে দেশে আসেন। এরা আদৌ আবার পুরানো কর্মস্থল ফিরে যেতে পাবেন কি না সেটা এখনও এক

বড় অনিশ্চয়তা। করোনার প্রকোপ কমে এলেও ইতোমধ্যে বিমানভাড়া, টিকেট পাওয়া, বিমান বন্দরগুলোতে কড়াকড়ি বাড়ায় শ্রমিকদের বিদেশ গমন কঠিন হয়ে আছে। এ নিয়ে ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার কারওয়ান বাজারে প্রবাসীরা কয়েক দফা বিক্ষোভও করেন। কারণ অনেকেই তারা নির্ধারিত তারিখে সৌদি আরবে যেতে পারছিলেন না বিমানের টিকিটের অভাবে।

এসময় এক সাক্ষাৎকারে ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল ইসলাম দৈনিক প্রথম আলোকে জানান, প্রবাসীদের অর্ধেকের বেশি চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন। পুনরায় কাজে যোগ দিতে না পারলে তাঁরা আর্থিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বেন।

পুনর্বাসন প্রশ্ন: সরকারের উদ্যোগ

প্রবাসী শ্রমজীবীদের মধ্যে যাঁরা চুক্তিভিত্তিক কাজ করতেন তাঁদের অনেকে মহামারিকালে বিদেশে আয়রোজগারহীন হয়ে পড়েন। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েন যাদের বৈধ ভিসা ছিল না। এদের বড় অংশই কাজ ও আয়ের অভাবে না খেয়ে দিনাতিপাত করে শেষমেষ দেশে এসেছেন। সরকার এরকম সকলের জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিগত বছরে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর এই শ্রমিকদের যেন আবার তাদের কাজের জায়গায় ফিরতে পারেন, সেজন্য কাজ করছে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটিও। বিদেশ থেকে শ্রমিকদের এই ফিরে আসা ঠেকাতে সেইসঙ্গে এরিমধ্যে ফেরত আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসনে এই কমিটি কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব নাসরিন জাহান।

করোনাকালে প্রবাসীদের সংকট মনিটরিংয়ে গঠিত কমিটির ফোকাল পারসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন প্রচারমাধ্যমকে বলেছেন, বিদেশের সব মিশন ও শ্রম বিভাগ থেকে নিয়মিত তথ্য নেওয়া হচ্ছে। মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের খাদ্য, আবাস, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা দেবে সরকার।

অভিবাসী গ্রহণকারী দেশগুলোর কাছে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যৌথ স্বাক্ষরিত একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তারা যেন শ্রমিকদের বাংলাদেশে ফেরত না পাঠিয়ে ওসব দেশেই বিকল্প কর্মসংস্থানে যুক্ত করার চেষ্টা করে। এছাড়া করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে যেসব প্রবাসী শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে ২০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে এই টাকা নেওয়া হবে। প্রত্যাগত শ্রমিক বা তাদের পরিবারের সদস্যরা সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ সুদে এক লাখ টাকা থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। সর্বশেষ বাজেটে দেশে ফেরা প্রবাসীদের জন্য বাড়তি আরও ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় বিভিন্নভাবে ব্যয় করার জন্য। তবে এসব উদ্যোগগুলো বাস্তবে কতটা কীভাবে কাজ করছে সে তথ্য অজানাই থাকছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য অনুসারে, প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে ৬-৭ লাখ মানুষ বিভিন্ন দেশে যায়। এই হিসাবে প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে ৫০ থেকে ৬০ হাজার মানুষ বিদেশে যায়। করোনার সময় এরকম বিদেশ যাত্রা বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন। অনেকে ভিসা ও কাজের অনুমতি পেয়েও যেতে পারেননি। ফলে দেশের বেকারত্ব পরিস্থিতিতেও বাড়তি নেতিবাচক চাপ তৈরি হয়েছে। এসব মিলে ২০২০ সালে প্রবাসী শ্রমিক খাতে যে বিপর্যয় দেখা দেয়– তার রেশ চলবে বর্তমান বছরেও।

সারণী-৬: করোনায় কয়েকটি দেশে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মৃত্যুর হিসাব
(২৫ অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব, সূত্র: প্রথম আলো, ২৬ অক্টোবর ২০২০)

দেশের নাম	মৃত্যু সংখ্যা
সৌদি আরব	৮৫০
কুয়েত	১০৩
ওমান	৭০
কাতার	৩৫
বাহরাইন	২৭
সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৯৮
যুক্তরাজ্য	৩৪০
যুক্তরাষ্ট্র	২৯২
ইতালি	১৬

ভিয়েতনাম ফেরতদের যেভাবে কারাগারে যেতে হলো

২০২০ সালে প্রবাসী শ্রমিকদের বিপন্নতার সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ছিল ভিয়েতনাম ফেরত ৮১ শ্রমজীবী আটক অধ্যায়। ১ সেপ্টেম্বর এদের পুলিশ আটক দেখায়। এসব শ্রমিক ভিয়েতনাম থেকে নিঃস্ব হয়ে দেশে এসে ১৮ আগস্ট সরকারের কোয়ারেন্টিনে ছিল ১৪ দিন। তারপর বাড়ি যেতে না দিয়ে এদের আটক করা হয়। দেশে আসার আগে এরা ভিয়েতনামেও এক দফা কিছু সময় আটক ছিলেন। একদিকে দালালের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারানো, অন্যদিকে ভিয়েতনাম ও দেশে পুলিশী আটকের ঘটনা বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের করুণ অবস্থাকে নির্দেশ করছিল। এসব শ্রমিকরা জানান, ভিয়েতনাম যাওয়ার আগে তারা সরকারের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়েই ভিয়েতনাম গিয়েছিলেন। দালালরা তাদের ভিয়েতনামের এক সোফা ফ্যাক্টরিতে কাজ দেয়ার কথা দিলেও সেই কাজ দেয়নি।

উল্লেখ্য, ভিয়েতনাম থেকে আসা প্রবাসী এই শ্রমিকদের আগে পুলিশ কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন থেকে আসা ২১৯ জন বাংলাদেশী শ্রমিককেও একইভাবে দেশে আসার পর আটক করে। অভিযোগ তোলা হয় এরা বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। কিন্তু ভিয়েতনাম ফেরত আটককৃতদের সূত্রে জানা যায়– বিদেশে প্রতিশ্রুত কাজ ও বেতন না পেয়ে তাদের ১৭ জন বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়েছিল অভিযোগ জানানোর জন্য। কিন্তু ঢাকায় সংবাদ ছড়ানো হয় তারা সেখানে দূতাবাস দখল করতে গিয়েছেন। আবার দেশে এই শ্রমিকদের গ্রেফতারের কারণ হিসেবে পুলিশ বলেছে, 'কোয়ারিন্টিনে থাকার সময় ভিয়েতনাম ফেরত এই শ্রমিকরা রাষ্ট্রবিরোধী শলাপরামর্শ করেছে। ফলে তাদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়।' এই ঘটনায় পত্রপত্রিকায় কয়েকটি প্রশ্ন তোলা হয়: প্রথমত প্রবাসে বিপদে পড়লে দূতাবাসে যাওয়া কী অপরাধ? আবার ভিয়েতনাম যদি তাদের শান্তিপূর্ণভাবে ফেরত পাঠাতে পারে তাহলে বাংলাদেশে তারা শান্তিপূর্ণভাবে কোয়ারিন্টিন শেষে বাড়ি যেতে পারবে না কেন? এই লেখা তৈরির সময় (সেপ্টেম্বর ২০২০) তাদের জামিন আবেদনের বিষয়টি হাইকোর্টে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল।

মহামারিতে শিশু শ্রমিক ও বাল্যবিয়ে বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা

বিশ্বের অনেকে দেশের মতোই বাংলাদেশেও মহামারিকালে শিশু বয়সীদের শ্রমখাতে আগমন বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মহামারিকালে দেশের স্কুলগুলো বন্ধ ছিল এক নাগাড়ে নয়-দশ মাস। ফলে দরিদ্র পরিবারের অনেক শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। আবার একই ধরনের পরিবারগুলোর অনেক শিশু পিতা-মাতার কর্মহীনতা বা আয় কমে যাওয়ার কারণে পরিবারের স্বার্থে বইপুস্তকের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে কাজে নেমে পড়েছে।

সবচেয়ে রক্ষণশীল হিসাবেও করোনায় বাংলাদেশে ১০ থেকে ১৫ লাখ মানুষের কর্মহীনতার শঙ্কার কথা বলা হয়েছিল। এ ধরনের পরিবারের অনেক শিশু যে নির্বিঘ্নে শিক্ষাজীবন চালিয়ে যেতে পারবে না সেটা প্রায় নিশ্চিত। এসব শিশু-কিশোরদের বড় অংশই ইতোমধ্যে শ্রম বাজারে ঠাঁই খোঁজার চেষ্টা করছে।

একই কারণে কোভিড পরবর্তী সময়ে দেশে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ের আধিক্যেরও শঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে প্রচারমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হচ্ছে। ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার ১৯ অক্টোবর লিখেছে, মহামারি কালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফল হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় অন্তত দু লাখ কিশোরীর আগে আগে বিয়ে হয়ে যেতে পারে। এদের অনেকে নির্ধারিত বয়সের আগেই সন্তান সম্ভবাও হয়ে পড়তে পারে। শিশু বিষয়ক সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনকে উদ্বৃত করে ডেইলি স্টার এই প্রতিবেদন তৈরি করেছিল।

'বাল্যবিবাহ সর্বনাশা একটি বিষয়,' মন্তব্য করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী প্রচারমাধ্যমকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সরকারের তদারকি, সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদির কারণে দেশে গত কয়েকবছর ধরে বাল্যবিবাহ কমে আসছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাস মহামারি আমাদের আবার পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

একদিকে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের অর্থনৈতিক সংকট এবং অন্যদিকে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বন্ধ থাকার মিলিত অভিশাপ হিসেবে শিশুশ্রম এবং বাল্যবিয়ের প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর অন্তত ১ কোটি ২০ লাখ মেয়েশিশু ১৮ বছরের আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ প্রতি তিন সেকেন্ডে একটি মেয়েশিশুর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এর মাঝেই করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে আগামী দুই বছরে অন্তত আরও ৪০ লাখ মেয়েশিশু বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে পড়বে। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ওয়ার্ল্ডভিশনের ২০২০ সালের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

৩০ সেপ্টেম্বর দৈনিক কালের কণ্ঠ এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাল্টিসেক্টরাল

প্রোগ্রাম সূত্রে জানা গেছে, করোনাকালে এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত দেশে মোট ৩৩০টি বাল্যবিয়ের খবর পেয়েছে মন্ত্রণালয়।

এদিকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) পক্ষ থেকে দেশের ৫৩টি জেলার মোট ৫৭ হাজার ৭০৪ নারী ও শিশুর ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, চলতি বছরের শুধু জুন মাসে বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে ৪৬২ জন কন্যাশিশু। মে মাসের তুলনায় জুন মাসে বাল্যবিয়ের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। মে মাসে বাল্যবিয়ের সংখ্যা ছিল ১৭০। অন্যদিকে কমে গেছে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের সংখ্যা। গত মে মাসে ২৩৩টি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করা গেলেও জুন মাসে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করা গেছে ২০৭টি। ব্র্যাকের জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি প্রোগ্রাম সূত্রে জানা গেছে, দেশে যেসব এলাকায় ব্র্যাকের কার্যক্রম চলমান, সেখানে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত মোট ৩৩০টি বাল্যবিয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২২০টি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করে ব্র্যাক।'

পথশিশুদের কে বাঁচাবে

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে শ্রমিক শিশুদের একটা বড় অংশ পথশিশু। দেশে এরকম ঠিকানাহীন শিশুর সংখ্যা কত তার পরিপূর্ণ ও হালনাগাদ তথ্য নেই। এক হিসাব মতে, বর্তমানে প্রায় ১১ লাখ পথশিশু রয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকই ঢাকায়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) হিসাবে, শুধু ঢাকা শহরে প্রায় সাড়ে চার লাখ পথশিশু রয়েছে। অন্য এক পরিসংখ্যান বলছে, দেশে মোট পথশিশুর ৩০ ভাগ মেয়ে। ৩ অক্টোবর দৈনিক সমকাল এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছে, পথশিশুদের প্রায় ৪৪ শতাংশ হতাশা থেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে, ৪১ শতাংশ শিশুর ঘুমানোর কোনো বিছানা নেই, ৪০ শতাংশ গোসল করতে পারে না, ৩৫ শতাংশ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে, ৫৪ শতাংশ অসুস্থ হলে দেখার কেউ নেই এবং ৭৫ শতাংশ শিশু অসুস্থ হলে চিকিৎসকের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারে না। এরকম সকলের জীবন করোনাকালে অধিকতর ঝুঁকির শিকার হয়েছে। এদিকে ২০ জুলাই বিভিন্ন সংবাদপত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)-এর এক জরিপের তথ্যে দেখা যায় ৩৭ ভাগ শিশুশ্রমিক জানিয়েছে করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়া মাত্র তাদের আগের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৪ জন শ্রমজীবী শিশুর মাঝে এই জরিপটি পরিচালিত হয়। জরিপে দেখা যায় আয় রোজগার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পেশা পরিবর্তন করেছে ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ শিশু। এদের মধ্যে অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছে। জরিপে এও দেখা যায়, করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরুর আগে নগরে শ্রমজীবী শিশুদের ৫৭ দশমিক ২ ভাগের মাসিক আয় ছিল ১-৩ হাজার টাকা। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ শুরু হওয়ার পরে সে সংখ্যাটি ৪৭ দশমিক ৭ ভাগে নেমে এসেছে। আবার ২১ দশমিক ৬ শতাংশ যারা ৩-৪ হাজার টাকা মাসে আয় করতো তাদের সংখ্যা নেমে এসেছে ৯ দশমিক ৮ শতাংশে। শতকরা ৩০ দশমিক ৯ ভাগ শিশু বলেছে তাদের আয়ের উপর পরিবার নির্ভরশীল। এসব শিশুদের করোনাকালীন সংকটে সহযোগিতায় ব্যাপকভিত্তিক কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি ২০২০-এ।

-

করোনায় নতুন করে ঋণগ্রস্ত নির্মাণ শ্রমিকরা

করোনা ভাইরাস সৃষ্ট দুর্যোগে নতুন করে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে নির্মাণ খাতের হাজার হাজার শ্রমিক। সরকার ঘোষিত লকডাউন ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক থাকায় প্রায় ৫ মাস বন্ধ ছিল রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোর নির্মাণ কাজ। এতে স্থানীয় মহাজন, এনজিও এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছে ২০ থেকে ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ করেছেন শ্রমিকরা। যার জন্য উচ্চহারে সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে। ঢাকায় নির্মাণ সংশ্লিষ্ট খাত হিসেবে পরিচিত ১১টি পেশার শতাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

শ্রমিকরা জানিয়েছেন, জীবনধারণের তাগিদে গরু, ছাগল, মুরগীসহ বিভিন্ন পোষা প্রাণী সস্তায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন অনেকে। ত্রাণের জন্য অনেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। একইসময়, অর্থাভাবে খাদ্যের চাহিদা কমিয়েছেন অনেক শ্রমিক। এছাড়া সাধারণ রোগেও পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে পারছেন না তারা।

নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়ে সরাসরি কাজ করেন এমন ব্যক্তিরা বলেছেন, করোনার শুরুতে বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের রক্ষায় সরকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করলে নির্মাণ শিল্পের শ্রমিকরা বঞ্চিত ছিল। দরিদ্রদের সুরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৫০ লাখ পরিবারের ঈদ উপহার থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন তারা। এই প্রতিবেদক যেসব শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে মাত্র দুজন জানিয়েছেন তারা প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার পেয়েছেন। তারা বলেছেন, জনপ্রতিনিধিরা তাদের নাম ও বিকাশ নম্বর নিয়েছেন– এবং সেই উপহারের জন্য তারা আজও অপেক্ষা করছেন। নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশের (ইনসাব) সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমরা যা দেখেছি তাতে নির্মাণ শ্রমিকরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছে। প্রায় ৭০ ভাগ শ্রমিক দিন আনে দিন খায়। এই বিপুল সংখ্যাক দিনমজুর সহায়তার বাইরে ছিল। এসব মানুষের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে।

সরকারি-বেসরকারি মতে, রাজমিস্ত্রি, রড মিস্ত্রি, রঙ মিস্ত্রি, ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, টাইলস, গ্রিলসহ ১১ রকমের পেশার সঙ্গে জড়িতদের নির্মাণ শ্রমিক বলা হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা দেশের সবচেয়ে বড় সংগঠন ইনসাবের হিসাবে, দেশে নির্মাণ শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩৫ লাখ। যার মধ্যে শুধু রাজ ও রড মিস্ত্রি হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করেন ১৮ লাখ মানুষ। ৩৫ লাখ শ্রমিকের পরিবারে গড়ে চারজন করে সদস্য থাকলে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ সরাসরি নির্মাণ শ্রমিকদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

নতুন দারিদ্র্য ও ঋণের শিকার নির্মাণ শ্রমিক

এপ্রিলের শুরুতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) জানায়, করোনাভাইরাস সৃষ্ট দুর্যোগে বিশ্বের ১৫০ কোটি মানুষ কর্মহারা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে দেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত জনশক্তি ৫ কোটি। করোনায় এসব মানুষ সরাসরি ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে ওইসময় জানায় আইএলও। এদের মধ্যে নির্মাণ শ্রমিকরাও অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি ঢাকার অন্তত সাতটি স্থানে রাজমিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, রড মিস্ত্রি ও মাটিকাটা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন এ প্রতিবেদক। এসব শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকা পর্যন্ত। গত ২৬ মার্চ লকডাউন শুরুর কয়েকদিন আগে অথবা পরে রাজধানী ছেড়ে গ্রামে চলে যান বেশিরভাগ শ্রমিক। অনেকে আটকা পড়লেও পরবর্তীকালে নানা কায়দায় ঢাকা ছেড়েছেন। এরকম অনেকে জানিয়েছেন তারা নদী ভাঙ্গনের শিকার অথবা ভূমিহীন। স্ত্রী, সন্তান, পিতা মাতাসহ পরিবারের সদস্যরা তাদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। ঢাকা থেকে টাকা পাঠালে সংসার চলে। তারা জানান, করোনার শুরুতে গ্রামের পরিস্থিতি ছিল আতংকজনক। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়াকড়িতে সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। বাজার এলাকায় গেলে পুলিশী নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছে। কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করা ছাড়া কোনো সুযোগ ছিল না। তবে নির্মাণ শ্রমিকরা এ কাজে অদক্ষ হওয়ায় বেশিরভাগই কাজ পাননি। ফলে উপার্জনহীন সংসারের অভিজ্ঞতা ছিল কষ্টকর।

এসময় শ্রমিকরা স্থানীয় মহাজনী ঋণ, স্থানীয় এনজিও'র ক্ষুদ্র ঋণ নিয়েছেন। এছাড়া সস্তায় গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী বিক্রি করে সংসার চালিয়েছেন। এই প্রতিবেদক যেসব নির্মাণ শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেছেন তাদের প্রায় সবাই দেশের অধিক দরিদ্রপ্রবণ জেলাগুলোর বাসিন্দা। তবে এসব জেলায় করোনায় সরকারি বরাদ্দের মাত্রা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার রডমিস্ত্রি নুর ইসলাম লকডাউনের শুরুতে গ্রামে যান। তিনি গত কোরবানীর ঈদের পর ঢাকায় ফিরেছেন। ৪ সেপ্টেম্বর কথা হয় তার সঙ্গে। তিনি বলেন, *চাইর হাজার ট্যাকা নিয়া বাড়ি গেছিলাম। কামের অভাব, ভাতের অভাব হাহাকারের দিন গেইছে। মহাজনের থাকি ২০ হাজার টাকা ঋণ করিচি। মাসে ২ হাজার সুদ দেওন লাগতেছে।* ভোলার রাজমিস্ত্রি মো. বাচ্চুর পরিবারে সাতজন সদস্য। করোনা আসার কিছুদিন আগে তিনি এনজিও'র ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। করোনা আসার পর দুটি এনজিও এবং স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে নতুন ঋণ করেছেন ৫০ হাজার টাকা। তিনি বলেন, আমগো মতো মানুষের একদিন কাম না করলে পরদিন বাজার করতে পারি না। সেই জাগায় ছয় মাস কাম বন্ধ– তাইলে অবস্থাটা কী বোঝেন! ঋণের জালে ডুইব্যা গেছি।

যেসব শ্রমিক ঢাকায় ছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা আরও খারাপ। একদিকে কাজ বন্ধ অন্যদিকে গ্রামে যেতে না পারা, এই দুয়ে মিলে এক দুর্ভোগময় পরিস্থিতি কাটিয়েছেন শ্রমিকরা। করোনায় ঢাকায় ছিলেন এরকম কয়েকজন রাজমিস্ত্রি ভোলার আব্দুর রহমান, আবুল বাশার, আমজাদ হোসেন ও জাকির হোসেন। তারা কাজ করেন রাজধানীর হাজারীবাগের টালি অফিস মোড় এলাকায়। এই প্রতিবেদককে তারা বলেন, শুরুতে কিছু বুঝি নাই। কিন্তু কয়দিন পরে বুঝছি কষ্ট কারে কয়। গেরামে বাপ মা বউ বাচ্চা না খেয়ে থাকা শুরু করলো। নিজেরাও খাইতে পাই না। শ্যাষে মালিক ১০০ ট্যাকা কইরা খোরাকির ট্যাকা দিছে। মালিকের কাছ থেইক্যা ট্যাকা নিয়া গেরামে পাঠাইছি।

আবুল কাশেম নামে একজন নির্মাণ শ্রমিক ঠিকাদার বলেন, আমার অধীনে ১০০ শ্রমিক কাজ করে। প্রতিদিন ফোন আইতো ভাই ট্যাকা দেন, ট্যাকা দেন! অবস্থা এমন যে ফোন বন্ধ কইরা রাখতে হইছিলো। এই সময় অনেক মালিক ট্যাকা দেয় নাই। আমি ৮০ হাজার ট্যাকা ঋণ কইরা হ্যাগো বিল শোধ করছি। ইনসাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নির্মাণ শ্রমিকরা অতি দরিদ্র। তাদের অন্তত ৭০ ভাগের এনজিও ঋণ আছে। এইসব শ্রমিক নতুন করে আরও ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। সরকারের উচিত বিভিন্ন সুরক্ষা ভাতার আওতায় এসব পরিবারকে সহায়তা করা।

- আশরাফুজ্জামান মণ্ডল

-

ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞায় জেলেদের সমস্যা

করোনাকালের শুরুতে কিছুদিন মাছের চাহিদা কমে গিয়েছিল। মানুষ আতংকে বাজার-হাটে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন। এ সময় পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে নদী ও সমুদ্রে ধরা মাছের সরবরাহেও বিঘ্ন ঘটে। সব মিলে মার্চ পরবর্তী কয়েক মাস জেলেদের আয় রোজগারে বড় আকারে টান পড়ে। কিন্তু অবস্থাটি দুঃসহ হয়ে পড়ে যখন এর মাঝেই ইলিশ মাছ ধরায় ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়। বছরের মে মাসে শুরু হওয়া এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত। এসময় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং আরো কয়েকটি সংস্থার এক যৌথ জরিপে দেখা যায়, করোনার আগে জেলেদের দৈনিক গড় আয় ছিল ৩৭০ টাকার মতো; আর করোনার শুরুতে সেটা নেমে আসে ১৭০ টাকায় এবং মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় (অন্যান্য কাজ করলেও) সেটা আরও অনেক কমে যায়। এসময় জেলেদের মাঝে ঋণগ্রস্ততা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। এছাড়া জেলে পরিবারগুলোতে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণও কমে। এতে এসব পরিবারের শিশু ও সন্তান-সম্ভবা নারীদের স্বাস্থ্য ক্ষতি হয়েছে অনেক।

বছরের শেষ দিকে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা মিলিয়ে অক্টোবরে শুরু হয় ইলিশ ধরায় ২১ দিনের দ্বিতীয় দফা নিষেধাজ্ঞা। ফলে জেলেদের পুরানো কাবু অবস্থা আরও নাজুক হয়। তবে সরকারের একজন কর্মকর্তার সূত্রে দৈনিক প্রথম আলোকে ২৪ সেপ্টেম্বর জানিয়েছে, করোনাকালে সরকার চার লাখ ৮৯ হাজার ৫৮৯ জন জেলেকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে। তবে জেলেদের মতে চাল-ডালের এসব সুবিধা কর্মহীন অবস্থায় খুবই অপ্রতুল।

মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা: সরকারের অবস্থান

২০১৫ সাল থেকে সরকার মাছের উৎপাদন বাড়াতে প্রজনন ঋতুতে ইলিশ মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ শুরু করে। মাছ ধরায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা নিয়ে অনেক সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন সময় সমালোচনামুখর হওয়ায় সরকার জেলেদের নিষেধাজ্ঞাকালীন প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছে। ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞাকালে সরকার উপকূলীয় ১৪ জেলায় ৪৪টি উপজেলায় চার লাখ ২০ হাজার জেলে পরিবারকে ৪০ কেজি চালসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সহায়তা দেয়। সরকার এও বলে থাকে, মাছ ধরার এই নিষেধাজ্ঞা প্রজনন মওসুমকে টেকসই করার জন্য। এ থেকে আজ ও আগামীকালের জেলেরাই লাভবান হয়ে থাকে। প্রণোদনা কর্মসূচি সেক্ষেত্রে বাড়তি এক উদ্যোগ। সরকারের দাবি বাৎসরিক এই নিষেধাজ্ঞা কর্মসূচির ফলে ইলিশসহ সকল মাছের পরিমাণ বেড়েছে এবং আহরণও কমেনি। বিগত বছরগুলোতে সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও দেখা গেছে দেশে ইলিশের উৎপাদন নিষেধাজ্ঞা পূর্বকালের চেয়ে বেড়েছে। তবে জেলেদের ভাষ্য হলো ইলিশ সাগরে যতটা ধরা পড়ে নদীতে ততটা নয় মোটেই। কারণ নদীমুখগুলো

ভরাট হয়ে থাকায় এবং নদীর পানি দূষিত থাকায় ইলিশের ঝাঁক এদিকে আসতে পারে না। যে কারণে এ বছর ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞার পর পদ্মা, মেঘনা, তেতুলিয়া ইত্যাদি নদীতে ইলিশ আশানুরূপ ধরা পড়েনি বলে খবর পাওয়া গেছে। আজকের বিজনেস বাংলাদেশ নামক একটা অনলাইন নিউজ পোর্টালে ২৩ সেপ্টেম্বর পাথরঘাটা মৎস্য কর্পোরেশন সূত্রের বরাতে জানানো হয়, ২০১৯ সালের নিষিদ্ধ সময়ের পর ২৪ জুলাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাথরঘাটা মৎস্য বন্দরে ৯৬০.৮৪৩ টন ইলিশের উৎপাদন হয়। এতে সরকার ৭২ লাখ ৯১ হাজার ৫২৬ টাকা রাজস্ব পায়। অন্যদিকে ২০২০ সালের ২৪ জুলাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ৪৯৪.২২৫ টন ইলিশের উৎপাদন হয়। সরকার রাজস্ব পায় ৩১ লাখ ৬৯ হাজার ৪০ টাকা; যা গত বছরের তুলনায় কম।

জেলে সম্প্রদায়ের চাওয়া

জেলে সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা সময় আরও কমিয়ে আনার দাবি করা হয়েছে। চালের পাশাপাশি নগদে কয়েক হাজার টাকা অর্থ সহায়তারও দাবি তুলেছে তারা। এছাড়া জেলেদের নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠনগুলো চাইছে জেলেদের মাঝে অন্যান্য কাজের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাড়ানো হোক। যাতে নিষেধাজ্ঞাকালে জেলে পরিবারগুলোর বিকল্প আয়ের সুযোগ থাকে। এসব সংগঠনের আরেকটি দাবি– যেহেতু কার্ডধারী জেলেদেরই কেবল সহায়তা দেয়া হচ্ছে সেকারণে বিদ্যমান কার্ডধারীরা সকলে জেলে কি না এবং সাধারণ জেলেরা কার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কি না সেটাও ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করে দেখা হোক।

জেলেদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া হলো মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময় বাংলাদেশের জেলেরা সমুদ্রে যেতে না পারলেও ভারত ও বার্মার জেলেরা সমুদ্রে যায় এবং বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে মাছ ধরে নিয়ে যায়; এটা যেন প্রতিরোধ করা হয়। ইতোমধ্যে কিছু কিছু ভারতীয় জেলে বাংলাদেশের কোস্ট গার্ডের হাতে আটক হওয়া থেকে জেলেদের ঐ দাবির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। যতদূর জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে পোনা ইলিশ ('খোকা ইলিশ') ধরা বন্ধে আইন আছে, নিষেধাজ্ঞাও আছে। কিন্তু সেখানে সেটা তেমন মানা হয় না। মাছ বাংলাদেশের প্রোটিনের বড় উৎস। এর মাঝে ইলিশের রয়েছে বড় এক ভূমিকা কিন্তু জেলে সমাজকে রক্ষা করেই সে উৎস রক্ষা করতে হবে।

সারণী-৭: ইলিশ ধরা সাধারণ জেলেদের প্রধান কয়েকটি সংকট

বছর জুড়ে মাছ ধরায় দীর্ঘ সময়ের নিষেধাজ্ঞা
নিষেধাজ্ঞাকালে আর্থিক অনটন
ঋণগ্রস্ততা
নিষেধাজ্ঞাকালে বিকল্প কাজের অভাব এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব
প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন না থাকা
জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রান্তিকতা

-

ইলিশ প্রসঙ্গে ভোলার নাছির মাঝি ঘাটের এরশাদ ফরাজীর কথা

ভোলার নাছির মাঝি ইলিশঘাটে আলাপ হচ্ছিল এরশাদ ফরাজীর সঙ্গে। কেউবা তাকে চিনেন এরশাদ মাঝি নামেও। ভোলা জেলা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি তিনি। আলাপ প্রসঙ্গে এরশাদ ফরাজী বলছিলেন– 'কী করে আপনাদের বোঝাই, এবার ইলিশ নেই। আমাদের অবস্থা এবার এতটাই মন্দা, ১৪ অক্টোবর নিষেধাজ্ঞার আগ পর্যন্ত ভরপুর ইলিশ পাওয়া গেলেও মৎস্যজীবী, আড়তদারেরা লোকসানে থাকবে। এবছর বিনিয়োগের অর্ধেকটাও উঠবে না। এরশাদ ফরাজী বলেন, মিডিয়ায় ঝাঁকে ঝাঁক ইলিশ পাওয়ার খবর দেখে আমরা অবাক হই। 'ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পাওয়ার' অর্থ আমরা বুঝতেছি না। একটু বুঝিয়ে বলবেন কী? চাঁদপুর ইলিশ বাজার, ঢাকার সোয়ারিঘাট, কলাপাড়ার মহিপুর, বরগুনার পাথরঘাটা কিংবা কক্সবাজারের ফিশারী ঘাটে গিয়ে অনেক ইলিশ দেখে যদি বলেন 'ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পাচ্ছে জেলেরা'– তাহলে সেটা ভুল তথ্য। ওইসব ঘাটে এসে জমা হয় সবখানের ইলিশ। সেখানে ইলিশ আহরণের সঠিক চিত্র পাবেন কীভাবে? উপকূলে এসে অন্তত ১০টি ইলিশ ঘাট ভিজিট করুন; ইলিশ আহরণের আসল ছবি দেখতে পাবেন।

- সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম মন্টু'র ফেসবুক থেকে, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০

করোনায় অসুস্থ পাথরভাঙ্গা সিলিকোসিস রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা ব্যাহত; মারা যাচ্ছেন অনেকে

লকডাউনের বিরতির পর দেশজুড়ে আবার পাথরভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে গেছে। একই সঙ্গে পাথরভাঙ্গা শ্রমিকদের রোগযন্ত্রণার বিস্তৃতিও বাড়ছে। ২০২০-এর জুনে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, কেবল লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বুড়িমারিতে শতাধিক পাথরভাঙ্গা শ্রমিক ধুলোজনিত সিলিকোসিস রোগে অসুস্থ হয়ে আছে। অনেকেই তারা করোনার প্রাদুর্ভাবে কাজ বন্ধ থাকায় আয়রোজগারের সংকটে ভুগছিলেন। অর্থের অভাবে সিলিকোসিসের চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না। করোনাকালে এই রোগীরা বিশেষভাবে বাড়তি সামাজিক সংকটেও পড়েন। কারণ সিলিকোসিস শ্বাসযন্ত্রভিত্তিক সমস্যা হওয়ায় অনেকেই তাদের করোনার শ্বাসযন্ত্রজনিত সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন। এতে তাদের প্রাত্যহিক চিকিৎসাও ব্যাহত হয়।

উপরে উল্লিখিত ডেইলি স্টারের প্রতিবেদনে বুড়িমারী স্থলবন্দর এলাকার কামারের হাট গ্রামের মৃত মমতাজ উদ্দিনের ছেলে পাথরভাঙ্গা শ্রমিক তোফাজ্জল হোসেন (৫৫)-এর বিবরণ তুলে ধরে বলা হয়: 'সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন তিনি। সাত বছর ধরে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য শেষ সম্বল বসতভিটার ৮ শতাংশ জমিও বিক্রি করতে হয়েছে তাঁকে। আশ্রয় নিয়ে থাকতে হচ্ছে অন্যের জমিতে।' তোফাজ্জল হোসেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, দারিদ্র্যের কারণে ১১ বছর আগে বুড়িমারিতে পাথরভাঙ্গা শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। প্রায় পাঁচ বছর কাজ করার পর সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হন। এর পর থেকে ধুকে ধুকে মরছেন। তোফাজ্জল হোসেনের ১৫ সঙ্গী-সাথীও তাঁর সঙ্গে একইভাবে রোগাক্রান্ত হয়। যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইতোমধ্যে মারাও গেছেন। এরকম মৃতদের মাঝে আছেন বুড়িমারী পাথরভাঙ্গা শ্রমিক সুরক্ষা কমিটির সভাপতি মমিন আলীও। ২০২০ সালে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার সময় অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাবে মারা যেতে হয় তাঁকে।

স্থানীয় আরেক রোগাক্রান্ত পাথরভাঙ্গা শ্রমিক ৪৫ বছর বয়সী রশিদুল করিম বলেন, 'যখন চিকিৎসা করি তখন একটু ভালো থাকি। আর চিকিৎসা বন্ধ করলে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সবসময় চিকিৎসা খরচ যোগাতে পারছি না। রাজধানীর বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, রংপুর ও লালমনিরহাটে চিকিৎসা করতে গিয়ে এক বিঘা আবাদি জমি বিক্রি করে দিয়েছি। এখন আর বিক্রি করার মতো কিছু নাই। অর্থাভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না।'

সিলিকোসিস রোগে গত ৬ থেকে ৭ বছরে ৬৭ জন পাথরভাঙ্গা শ্রমিক

মারা গেছেন জানিয়ে পাটগ্রামের বুড়িমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ নেওয়াজ নিশাত সংবাদমাধ্যমকে ২০২০ সালের জুনে বলেছেন, 'আমার ইউনিয়নে তালিকাভুক্ত ১০০ পাথরভাঙ্গা শ্রমিক আছেন, যারা সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছেন। তালিকার বাইরেও অনেক পাথরভাঙ্গা শ্রমিক আছেন আক্রান্ত অবস্থায়।' রোগের শুরু হয় খাওয়ার অরুচি দিয়ে। এসময় ফুসফুসে এক ধরনের প্রলেপ পড়তে শুরু করায় বুকে ব্যাথা হয় এবং শ্রমিকরা পুনঃপুন কাশতে শুরু করেন।

সতর্ক হলে এই বিপর্যয় এড়ানো যেত

পাটগ্রামের বুড়িমারিসহ যেসব এলাকায় সিলিকোসিস রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে সেখানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে–সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত অনেক শ্রমিকই ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে মাঝ বয়সেই কাজ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলছেন। অথচ সতর্কতার সঙ্গে পাথার ভাঙ্গা হলে এবং শ্রমিকরাও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করলে এরকম বিপর্যয়কর অবস্থা এড়ানো যেতো। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ধুলো উড়িয়ে ক্র্যাশার মেশিনে পাথর ভাঙ্গা হচ্ছে এবং শ্রমিকরা নাকে-মুখে কোন ধরনের মাস্ক না পরেই দীর্ঘসময় ক্র্যাশার মেশিনের আশে-পাশে কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক শ্রমিকই এই পেশায় আসার শুরুতে একাজের সম্ভাব্য স্বাস্থ্যক্ষতি সম্পর্কে অবহিত থাকেন না বা তাদের সেটা অবহিত করা হয় না। আবার অনেক নবীন ব্যবসায়ীও হুটহাট পাথর ভাঙ্গার কাজে নেমে পড়তে পারেন– প্রশাসনিক নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ না থাকায়। এই খাতে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাতে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এবং পরিবেশ দূষণ এড়াতে কী কী করণীয় এ বিষয়ে অনেক ব্যবসায়ীই অবগত নন। আবার যারাও অবগত তারাও প্রশাসনিক কোন চাপ না থাকায় সেসব পদক্ষেপ না নিয়েই ব্যবসা অব্যাহত রাখতে পারছেন।

২০২০ সালেও এই চিত্রের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ সুরক্ষাসামগ্রী মাস্ক না পরেও অনেক শ্রমিক পাথর ভাঙ্গার প্রক্রিয়ায় প্রতিদিন দীর্ঘসময় কাজ করে যাচ্ছেন। 'গামছা বা কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে কাজ করলে অস্বস্তি লাগে। তাই মাঝে মাঝে মাস্ক ব্যবহার করলেও প্রায়সময় খোলা রেখে কাজ করি,' এমনটি জানালেন বুড়িমারির একজন শ্রমিক।

তবে কোন কোন শ্রমিক পাথর ভাঙ্গার কাজের ঝুঁকি জানা সত্ত্বেও একাজে যুক্ত হচ্ছে বিকল্প কোন কর্মসংস্থান না পেয়ে। প্রান্তিক জেলাগুলোতে বর্তমানে ধান মওসুমের বাইরে অন্য ঋতুতে কর্মসংস্থানের খুবই অভাব। ফলে যখনি কোন খাতে কোন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিবেচনা অগ্রাহ্য করেই শ্রমিকরা আয়-রোজগারের তাড়নায় তাতে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। এভাবেই লালমনিরহাটের বুড়িমারীতে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে পাথরভাঙ্গা খাতে যুক্ত হয়ে আছে। এসব শ্রমিকদের অনেকেই প্রয়োজনীয় মাস্ক ব্যবহার না করে পাথরভাঙ্গার কাজ করায় নিয়মিত তাদের নাক-

মুখ দিয়ে পাথরের ডাস্ট ভেতরে ঢুকে ফুসফুসের ক্ষতি করছে। আর ক্রমে তারা সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। দিনে মাত্র ৩-৪ শ টাকা মজুরির বিনিময়ে এই সর্বনাশ সাধিত হচ্ছে।

পাটগ্রামের বাইরেও দেশের অন্যান্য স্থানেও এই কাজ শুরু হওয়ায় তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এই স্বাস্থ্য সমস্যার বিস্তার ঘটতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। যেমন বছরের জুলাইয়ে এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, সিলেট নগরীর শাহজালাল ব্রিজ সংলগ্ন কদমতলী ফেরিঘাট এলাকায় সুরমা নদীর চরে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে পাথরের বড় বড় স্তুপ আর ক্রাশার মেশিন দিয়ে চলছে সেগুলো ভাঙ্গার কাজ। এলাকার মানুষ ভয়ে এ বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী নন। প্রতিদিন সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে চলছে ক্রাশার যন্ত্র। প্রতিদিন প্রায় অর্ধকোটি টাকার পাথর কেনাবেচা হয় সেখানে। স্থানীয়রা আশা করছিলেন বিষয়টি পরিবেশ বিভাগের নজরে পড়বে এবং পাথর ভাঙ্গার কাজে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা আরোপিত হবে। আবার এও জানা গেছে, মাঝে মাঝে এই কার্যক্রম বন্ধ হয় এবং আবার কিছুদিন পর তা অজ্ঞাত কারণে চালু হয়।

জাতীয় গণমাধ্যমগুলোতে প্রায় প্রতি জেলা থেকে এভাবে পাথ রভাঙ্গাজনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছে ২০২০ সালে বছরজুড়ে। সুদূর বান্দরবানের গহীন এলাকাগুলোতেও নদীপাড় থেকে পাথর তুলে তা ক্রাশার মেশিন দিয়ে যত্রতত্র ভাঙ্গার ঘটনা শনাক্ত করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ভ্রাম্যমান আদালত কখনো কখনো এভাবে অবৈধ পাথর উত্তোলন ও ভাঙ্গার কাজ বন্ধ করলেও জাতীয়ভিত্তিক সুষ্ঠু নীতিমালা এবং শ্রমিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার না হলে বিরাট সংখ্যক দরিদ্র শ্রমিক সমাজের অজান্তেই শিগগির সিলিকোসিস রোগের শিকার হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা যায়।

-

পাথর আমদানিও বাড়ছে

পাথর ভাঙ্গায় স্বাস্থ্যক্ষতির প্রাদুর্ভাব বাড়ার পাশাপাশি দেশে পাথরের ব্যবহার, উত্তোলন এবং আমদানিও বাড়ছে বলে সংবাদপত্র সূত্রে জানা যাচ্ছে।

পাঁচ বছর আগে পাথর আমদানির উৎসস্থল ছিল ভারত ও ভুটান। আমদানি হতো স্থলবন্দর দিয়ে। স্থলবন্দর দিয়ে ট্রাকে করে পাথর এনে চাহিদা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে, বিকল্প উৎস হিসেবে বিভিন্ন দেশ থেকে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে প্রথম পাথর আমদানি শুরু হয়। বিকল্প উৎসের মধ্যে শুরুতে ভিয়েতনাম ও চীন শীর্ষ স্থানে থাকলেও ক্রমে সে স্থান দখল করে নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। তিন বছর আগে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ১০ লাখ টন পাথর আমদানি হতো। সর্বশেষ তা বেড়ে হয়েছে ৫০ লাখ টন।

এক দশকের বেশি সময় ধরে একক পণ্য হিসেবে আমদানির পরিমাণের দিক থেকে তালিকায় শীর্ষ স্থানে ছিল সিমেন্টশিল্পের কাঁচামাল ক্লিংকার। গত অর্থবছর দেশে ক্লিংকার আমদানি হয় ১ কোটি ৮৭ লাখ টন। প্রথম আলোর ১০ অক্টোবর ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী পাথর আমদানির পরিমাণ এর চেয়ে মাত্র সাত লাখ টন কম। ২০২০-২১ অর্থবছরেই তা ছাড়িয়ে যাবে বলে আমদানিকারকদের ধারণা।

ইতোমধ্যে এই বাজারের আয়তন অর্থের হিসাবে ছয় হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। কিন্তু পাথর ব্যবহারের স্বাস্থ্যসম্মত তদারকির বিষয়ে সচেতনতা কম হলে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ৪৭৭ কোটি টাকা জমা হলো

২০২০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২২তম বোর্ডসভায় জানানো হয়েছে এ পর্যন্ত দেশি এবং বহুজাতিক মিলে ১৭৩টি কোম্পানী নিয়মিতভাবে এ তহবিলে তাদের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ জমা দিয়ে আসছে। তাতে এ তহবিলে জমা হয়েছে ৪৭৭ কোটি টাকা। জমা হওয়ার এই ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

এদিকে ২০২০ সালের জুলাই পর্যন্ত পাওয়া হিসাবে দেখা যায়, এ তহবিলে সর্বোচ্চ জমাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণফোন এককভাবে ১৫১ কোটি ৬০ লাখ ৭৯ হাজার ৯৬০ টাকা জমা দিয়েছে।

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২২তম বোর্ডসভায় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা এবং তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা বাবদ ১ হাজার ২৮৫ জন শ্রমিকের নামে ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকার সহায়তার অনুমোদন দেয়া হয়।

করোনাকালে এটা ছিল দ্বিতীয় সহায়তা উদ্যোগ। এর আগেও ১ হাজার ৯৬০ জন শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে প্রায় ৬ কোটি ২৬ লাখ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয় বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুদানের চেক প্রদান করার জন্যও মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী দেশী-বিদেশী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের বছর শেষে মোট লাভের ৫ ভাগের এক দশমাংশ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা দেয়ার বিধান রয়েছে। দেশে এরকম প্রতিষ্ঠান রয়েছে কয়েক হাজার। যদিও তহবিলে নিয়ম অনুযায়ী অর্থ জমা দিচ্ছে সামান্য সংখ্যক কোম্পানি।

এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা এবং তাদের মেধাবী সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দেয়া হয়। তহবিল প্রতিষ্ঠার পর থেকে শ্রমিকদের এ ধরনের সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

এ পর্যন্ত এই তহবিল থেকে শ্রমিকদের ৪০ কোটি টাকা সহায়তা দেয়া হয়েছে বলে ২০২০ এর ২০ সেপ্টেম্বরে দৈনিক ইত্তেফাক

এবং ২১ সেপ্টেম্বরের দৈনিক কালের কণ্ঠসহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যদিকে দৈনিক দেশ রূপান্তরের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৬ সাল থেকে এই তহবিলে অর্থ জমা হওয়া শুরু হয়েছে। এবং এই অর্থের মধ্যে অন্তত ৩২৮ কোটি টাকা রাষ্ট্রায়াত্ব বিভিন্ন ব্যাংকে এফডিআর করা আছে। বাকি অর্থ তখনও মূল হিসাবেই ছিল।

শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন, প্রতি তিন মাস অন্তর পরিচালনা পর্ষদের সভা হওয়ার কথা। সেখানে যাচাই-বাছাই শেষে চূড়ান্ত হয় কাদের সহায়তা দেওয়া হবে। তবে জনবল সংকটসহ নানা কারণে তিন মাস পর পর কমই সভা করতে পারছে পর্ষদ। আবার সহায়তা পাওয়ার আবেদনপত্র পূরণে এত জটিলতা রয়েছে যে, অল্প শিক্ষিত শ্রমিকদের পক্ষে সেটা পূরণ করা দুরূহ। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অনেক ব্যক্তির স্বাক্ষর জোগাড় করতে হয় আবেদনপত্রের জন্য। সামান্য ভুলত্রুটি হলেই সেই আবেদনপত্র বাতিল করে দেয় ফাউন্ডেশন। শ্রমিক সংগঠনগুলো করোনাকালে তহবিল থেকে সাহায্য বাড়ানোর দাবি করেছে।

সারণী-৮: শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের ২০২০ সালের চিত্র (তথ্যসূত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক)

মোট জমা হওয়া অর্থ	৪৭৭ কোটি টাকা (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)
সর্বোচ্চ জমাকারী প্রতিষ্ঠান	গ্রামীণ ফোন (১৫১ কোটি ৬০ লাখ ৭৯ হাজার ৯৬০ টাকা; জুলাই পর্যন্ত)
অর্থ জমাদানকারী কোম্পানির সংখ্যা	১৭৩টি (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

-

চা শ্রমিকদের মজুরি সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ?

২০২০ সালের শুরুতে একজন চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল (সবচেয়ে ভালো বাগানগুলোতে) ১০২ টাকা। ডলারের হিসাবে তা ১ দশমিক ২০ ডলারের মতো। অর্থাৎ যদি মাসের ৩০ দিনই কাজ করে তাহলে একজন চা শ্রমিক মজুরি পাবে ৩৬ ডলার। ঐ ৩৬ ডলারের সঙ্গে ভর্তুকি দামে ৫ কেজি চাল বা আটা এবং বছরে দুটি উৎসব ভাতা (৪৫৯০ টাকা করে) পায় শ্রমিকরা। বাগানের জমিতে তাদের থাকতেও দেয়া হয় বিনা ভাড়ায়। সব মিলে একজন চা শ্রমিকের মাসিক প্রাপ্তি ৫০ ডলারের মতো বলা যায়। তবে এসবই রেজিস্ট্রার্ড শ্রমিকদের জন্য। অস্থায়ী শ্রমিকদের প্রাপ্তি আরও কম।

মাসে ৫০ ডলার মজুরি বহির্বিশ্বে কিছুটা অবিশ্বাস্য এখন। বিশেষ করে কোন দেশের প্রধান কোন অর্থনৈতিক খাতে। বাংলাদেশের শ্রমখাতে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা-আপত্তি চোখে পড়ে কমই। ২০০৯ সালে এই মজুরি ছিল দৈনিক ৪৮ টাকা ৫০ পয়সা। ২০১৩ সালে হয়েছে ৬৯ টাকা। ২০১৫ সালে হয় ৮৫ টাকা। এরপর ধাপে ধাপে বেড়ে আজকের অবস্থায় এসেছে। কয়েক বছর পর পর 'চুক্তি'র মাধ্যমে এভাবেই চা শ্রমিকদের মজুরি 'বৃদ্ধি পাচ্ছে'। সর্বশেষ দৈনিক ১০২ টাকার মজুরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ২০১৮ সালের আগস্টে। অর্থাৎ এই চুক্তিরও আড়াই বছর পেরিয়ে গেছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় নতুন করে চা শ্রমিকদের যে মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয়েছে তাতে দৈনিক মজুরি নির্ধারিত হলো ১২০ টাকা। অর্থাৎ দু' বছর পর ১৮ টাকা মজুরি বেড়েছে শ্রমিকদের।

নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গেই মালিক সংগঠনের এই মজুরি বিষয়ক চুক্তি হচ্ছে। ফলে আইনী দিক থেকে এই প্রক্রিয়া বৈধ বলেই স্বীকৃত।

কিন্তু চা শ্রমিকদের এই মজুরি কাঠামো দুটি সমস্যা সামনে নিয়ে আসছে। প্রথমত এরকম মজুরি কাঠামো সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সংগে সাংঘর্ষিক কি না? দ্বিতীয়ত এই মজুরি কাঠামো দেশের অন্যান্য শিল্পখাতের বিদ্যমান মজুরি কাঠামোর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ?

৫০ ডলার টাকার হিসাবে সাড়ে চার হাজারেরও কম। এই হিসাবে সবচেয়ে ভালো বাগানের চা শ্রমিকদের মজুরি পোশাক খাতের সপ্তম গ্রেডের শ্রমিকের আয়ের চেয়েও কম। পোশাক খাতে সর্বনিম্ন মজুরি এখন আট হাজার টাকার উপরে। ফলে কোনভাবেই চা শ্রমিকদের মজুরি অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায় না। দেশের কৃষিশ্রমিকরাও বর্তমানে

মওসুমের সবচেয়ে খারাপ সময়েও ৩-৪ শত টাকার বেশি দৈনিক আয় করে থাকেন।

চা শ্রমিকদের পক্ষে মালিকদের সঙ্গে দরকষাকষি কর্তৃপক্ষ হলো চা শ্রমিক ইউনিয়ন। এই সংগঠনের নেতৃত্ব সর্বশেষ ৩০০ টাকা দৈনিক মজুরি দাবি করছিলেন। ২০২০ সালের অক্টোবরে বিভিন্ন বাগানে ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে কর্মবিরতিও পালিত হয়। কিন্তু পাওয়া গেছে ১২০ টাকা।

মালিকরা মজুরি বেশি বাড়াতে মোটেই রাজি নেই। অর্থাৎ চা খাতকে এই খাতের মালিকরা দেশের শ্রম মজুরির জাতীয় পরিসরের বাইরেই রাখতে চাইছেন। কিন্তু সরকার যদি দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করতে চায় তাহলে এই মজুরি কাঠামো জারি রাখা সরকারের সকল কর্মসূচির বিপক্ষেই যায়। কারণ খাদ্য গ্রহণ বা দৈনিক আয় যে পদ্ধতিতেই দারিদ্র্য পরিমাপ করা হোক না কেন দৈনিক ১০২ টাকা আয়কারী কোনভাবেই দারিদ্র্য পরিস্থিতি থেকে নিজের উত্তরণ ঘটাতে পারছে না বা পারবে না।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে দৈনিক যারা এক ডলার ৯০ সেন্টের নিচে আয় করছেন তারা 'দরিদ্র'। এই হিসাবে চা বাগানের পুরো কমিউনিটিই গড়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে পড়ে আছে। যা সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশ সরকার যেখানে দেশকে ২০৩০ এর মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে সেখানে দৈনিক এক দশমিক ৯০ সেন্টের নিচে কারো মজুরি নির্ধারণ এবং ঐ মর্মে চুক্তি কতটা ন্যায়ত হচ্ছে তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে বৈকি। বাংলাদেশে যেহেতু প্রতি বছর মানুষের গড় আয় বাড়ছে– সে কারণে দারিদ্র্য পরিমাপের মানদন্ডও উন্নীত হবে এটাই স্বাভাবিক। এরকম অবস্থায় বড় একটি শিল্পখাতে সচেতনভাবে শ্রমজীবীদের দারিদ্র্যের চক্রে আবদ্ধ রাখার সুযোগ কোথায়? যেখানে পুরো খাতটি প্রতি বছর অর্থনৈতিকভাবে লাভ করছে এবং তাতে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। চা খাত বাংলাদেশের জিডিপিতে অন্তত এক ভাগ অবদান রাখছে বলে বলা হয়।

২০১৯ সালে বাংলাদেশের চা খাত ১৬৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন করে বলেও জানানো হয়। সেসময় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৬০ লাখ কেজি। কেজি প্রতি আড়াই ডলার হিসাবে এই চায়ের আনুমানিক দাম দাঁড়ায় প্রায় ২ হাজার ১৬ কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে এক থেকে দেড় লাখ শ্রমিকের পেছনে ঐ অর্থের কত শতাংশ খরচ হচ্ছে?

সারণী-৯: চা বাগানে মজুরি বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা (দৈনিক/টাকা)	
২০০৯	৪৮.৫০
২০১৩	৬৯
২০১৫	৮৫
২০১৮	১০২
২০২০	১২০

২০১৮ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং ইউনিসেফ কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে চা শ্রমিক পরিবারগুলোর মধ্যে তিন চতুর্থাংশই দরিদ্র। অথচ একই সময়ে উক্তরূপ দারিদ্র্য জাতীয় পর্যায়ে ছিল মাত্র এক চতুর্থাংশ পরিবারে।

চা বাগানের মালিকরা শ্রমিকদের মজুরির প্রসঙ্গ উঠলে বাগান পরিচালনায় লোকসানের কথা বলেন। তাঁদের এই দাবি নিরপেক্ষ কোন সূত্র দ্বারা সমর্থিত হয়নি আজো। বাগান মালিকরা কখনোই আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব শ্রমিকদের কাছে প্রকাশ করেন না। তবে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক তাদের পরিচালিত চট্টগ্রামের তিনটি বাগানের আয়-ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করার পর দেখা গেছে সেখানে এক বছরের ব্যবধানে ১১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে মুনাফায়।

এটা মোটেই অস্বাভাবিক কোন চিত্র নয়। বিশ্বজুড়ে পানীয় হিসেবে চায়ের চাহিদা বাড়ছে। সে কারণে উৎপাদক দেশগুলোতে শ্রমিকদের মজুরিও বাড়ছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশি ভারতে চা শ্রমিকদের মজুরি ডলারের হিসেবে বাংলাদেশী শ্রমিকদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। শ্রীলঙ্কায় এটা প্রায় চার গুণ বেশি।

বাগানগুলোর কাজ ও থাকার পরিবেশের ক্ষেত্রেও ভারত ও শ্রী লঙ্কা অনেক এগিয়ে। করোনাকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগানেই ঝুঁকি সত্ত্বেও শ্রমিকরা কাজ অব্যাহত রেখেছিল। চা শ্রমিক ইউনিয়নের শ্লোগান হলো: 'কর্মই ধর্ম'।

২০২০ ছিল চা শ্রমিকদের খাদ্যাভাবের বছর

সরকার অন্যান্য খাতে করোনাকালে কিছু দিন লকডাউন ব্যবস্থা রাখলেও চা বাগানে সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। কিছু শ্রমিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বলেও শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মীরা দাবি করেছেন। তবে করোনার সময় সবচেয়ে বেশি সংকট তৈরি হয় কাজের অভাবে। এসময় বাগানের আশেপাশে কৃষি মজুরি বা বাসাবাড়িতে কাজের সুযোগ কমে যাওয়ায় চা শ্রমিক পরিবারগুলোতে দুর্ভিক্ষতুল্য অবস্থা তৈরি হয়। প্রায় প্রতিটি চা বাগানে প্রচুর বেকারত্ব থাকায় অনেক পরিবারেই কেউ না কেউ বাগানের বাইরে বাঙ্গালিসমাজে জমিতে বা বাড়িতে দৈনিক মজুরি শ্রমে যুক্ত থাকে। বর্তমানে বাগানগুলোতে শ্রমিক পরিবারগুলোর যত মানুষ কাজ করে– বাগানের বাইরে তার চেয়ে বেশি মানুষকে কাজ করতে হয় পরিবার বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে।

কিন্তু মহামারীকালে এরকম কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু বাগানে বহু পরিবার চরম খাদ্যাভাবে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকার অনেক এনজিওকে বিভিন্ন বাগানে খাদ্য সরবরাহ করতে দেখা গেছে। তবে বড় কোন সমাজই সাময়িক সহায়তার উপর এভাবে বাঁচতে পারে না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের চা বাগানগুলোতে বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে মূলত একটি শ্রমিক ইউনিয়নই কাজ করতে পারছে। শ্রম আইনের কঠোরতার কারণে চা খাতে কেন্দ্রীয়ভাবে দ্বিতীয় কোন ইউনিয়ন করা দুরূহ হয়ে আছে।

চা-শ্রমিকরা কেবল জাতীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন করতে পারেন এবং একটি ইউনিয়ন করার জন্য মোট শ্রমিকের অন্তত ২০ শতাংশ ও সব প্রতিষ্ঠানের ২০ শতাংশকে সদস্য হতে হবে। মালিক ও সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকা বাগানগুলোতে একই সঙ্গে এরকম সমর্থন সংহত করে ইউনিয়ন গঠন সহজ নয়। অর্থাৎ আইনগতভাবেই চা খাত মালিকদের জন্য একটা সুবিধাজনক খাত হয়ে আছে। কিন্তু এখাতের শ্রমিকদের দারিদ্র্য সরকারের জন্য অস্বস্তিকর।

-

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা কাদের কাছে যাচ্ছে?

২০২০ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের এক অনুসন্ধানে (১৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগকারীদের নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সরকার জাতীয় বাজেটে এ ধরনের কর্মসূচির জন্য বিপুল সম্পদ রাখছে। যা দেশের জিডিপি'র প্রায় ২ শতাংশ। ২০২০-২১ সালের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ১৬.৭৪ শতাংশ বরাদ্দ বেড়েছেও। চলতি অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা। যা গত বছর ছিল ৮১ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা।

আবার হঠাৎ হঠাৎ সৃষ্ট দুর্যোগেও অনেক ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। বছরজুড়ে অনেক বয়স্ক নারী-পুরুষ ও বিধবারা পৃথক পৃথক কর্মসূচি থেকে ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু এসব ভাতা নিয়ে কিছু ব্যবস্থাপনাগত প্রশ্ন দেখতে পেয়েছে সিপিডি। প্রথমত. পরিমাণের দিক থেকে এসব ভাতা কম বলে মনে করেন তৃণমূলের উন্নয়নকর্মীরা। পাশাপাশি বয়স্ক মানুষের পক্ষে ভাতা নিতে ব্যাংকে যাওয়া অনেক কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ। আবার এও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সর্বশেষ যাঁরা ভাতা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশ দরিদ্র ছিলেন না। শেষের তথ্যটি গুরুতর।

মূলত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পাঁচটি খাত নিয়ে চার জেলায় (গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারি) প্রায় দেড় হাজার সুবিধাভোগী পরিবারে এক গবেষণা শেষে এই তথ্য উঠে আসে। গবেষণায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির যে খাতসমূহ বাছাই করা হয় সেগুলো ছিল গরীব মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রাথমিক স্কুল এবং মাধ্যমিক স্কুল কর্মসূচি, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি। চারটি জেলায় গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে, সেগুলো হলো কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা ও নীলফামারী।

সিপিডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যাদের বয়স্ক ভাতা দেওয়া হচ্ছে তাদের ৩২ দশমিক ২০ শতাংশ দরিদ্র। ৬৭ দশমিক ৮০ শতাংশ দরিদ্র নয়। একইভাবে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে উপবৃত্তি পাওয়াদের ৭২ শতাংশ দরিদ্র নয়। আর প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে উপবৃত্তি পাওয়াদের ৬৩ দশমিক ৮০ শতাংশ দরিদ্র নয়। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মাতৃত্বকালীন ভাতা– এই দুই প্রকল্পে দরিদ্রদের থেকে দরিদ্র নয় এমন ব্যক্তিরা বেশি সুবিধা পাচ্ছে। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাওয়াদের ৪৯ দশমিক ৬০ শতাংশ দরিদ্র এবং দরিদ্র

নয় ৫০ দশমিক ৪০ শতাংশ। আর মাতৃত্বকালীন ভাতা পাচ্ছে যারা– তাদের ৪১ দশমিক ৫০ শতাংশ দরিদ্র এবং ৫৮ দশমিক ৫০ শতাংশ দরিদ্র নয়।

সারণী-১০: সামাজিক নিরপত্তা খাতে সুবিধাভোগীদের চিত্র

কর্মসূচির নাম	সিপিডির অনুসন্ধানে সুবিধাভোগীদের মাঝে দরিদ্র
বয়স্ক ভাতা	৩২.২০%
মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে উপবৃত্তি	২৮%
প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে উপবৃত্তি	৩৬.২০%
মাতৃত্বকালীন ভাতা	৪১.৫০%

উল্লেখ্য, মহামারির সময় ৫০ লাখ দরিদ্র পরিবারকে নতুন করে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে দেয়ার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল সেখানেও প্রথম যাচাই-বাছাইকালে প্রাথমিকভাবে ৩৪ হাজার জন চিহ্নিত হয়েছিল যারা এই সুবিধা পাওয়ার মতো দরিদ্র নন। এই ঘটনাও সিপিডি'র উপরোক্ত গবেষণাকে পরোক্ষে সমর্থন করে।

১৬ সেপ্টেম্বর বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), অক্সফাম ইন বাংলাদেশ ও এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ভার্চুয়াল সংলাপে উপরোক্ত গবেষণা তুলে ধরা হয়। ঐ গবেষণা-প্রকাশনা-সংলাপে এও দাবি করা হয়, ভাতাগ্রহীতা নির্বাচনে ভুলভ্রান্তি এবং দুর্নীতি এড়াতে জাতীয় তথ্যভান্ডার দরকার।

এই সংলাপে উপস্থিত থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এ বি তাজুল ইসলাম বলেন, ভাতাভোগী নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে হবে। তিনি বলেন, যত দিন না সব গরিব মানুষকে ভাতার আওতায় নিয়ে আসা যায়, অন্তত তত দিন এই তালিকা প্রণয়নে সততার পরিচয় দিতে হবে। পাশাপাশি এই কাজ সুচারুভাবে করার জন্য তথ্যভান্ডার তৈরির বিষয়কে তিনি সমর্থনযোগ্য মনে করেন। কারণ সব মানুষের ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করতে হবে। তাজুল ইসলাম সিপিডি'র এই গবেষণা কাজকে ইতিবাচক বলেই মত দেন। যা সরকারের এই সংক্রান্ত কাজের সহায়ক হবে। প্রতিবেদনটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মত ছিল, সরকার প্রতিবছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ালেও তা এখনো পর্যাপ্ত নয়। বরাদ্দ আরও বাড়ানো দরকার। আবার সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক দক্ষতাও বাড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেছিলেন সিপিডির একজন জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো। সেই উপস্থাপনায় তিনি জানান, রাজনৈতিক বিবেচনা, পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে সামাজিক নিরাপত্তার বরাদ্দ সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছায় না। এখন যাঁরা ভাতা পাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের বৃত্তি কর্মসূচিতে ভুল সুবিধাভোগীদের কাছে ভাতা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি। আর তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি সঠিক সুবিধাভোগী বাছাই হচ্ছে দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজনের ক্ষেত্রে। তবে কর্মসূচিতে ভাতার দৈনিক পরিমাণ খুব কম। মাত্র ২০০ টাকা।

গবেষকরা আরো যে সমস্যার কথা জানিয়েছেন তার মধ্যে একটি হলো কর্মসূচিসমূহের তথ্যের অপ্রতুলতা। সাধারণত যাঁরা আগে ভাতা পেয়েছেন এবং চেয়ারম্যান-মেম্বারের 'কাছের মানুষ', তাঁরাই এর খোঁজখবর পান। অন্যদের পক্ষে খবর পাওয়া কঠিন হচ্ছে। এ ছাড়া ভাতাভোগী নির্বাচনে সরকারের সব নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন হয়ে আছে। যেমন হতদরিদ্র ও দরিদ্ররা একই হারে ভাতা পান। অথচ হতদরিদ্রদের ভাতার পরিমাণ বেশি হওয়া উচিত।

কয়েকজন বক্তা এও বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা মূলত গ্রামীণ দরিদ্রদের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছে, যদিও নগরে দরিদ্রদের বিপন্নতা বেশি। তাঁদের দিকেও নজর দেওয়া উচিত। সেইফটি এন্ড রাইটসসহ অনেক সংগঠনই নগর এলাকার শ্রমজীবীদের জন্য পৃথক ও বড় আয়তনে সামাজিক নিরাপত্তাজালের দাবি জানিয়ে আসছে। এসব সংগঠন মনে করে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার প্রধান এক দাবিদার দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষ। যারা বেশি থাকে নগরে।

-

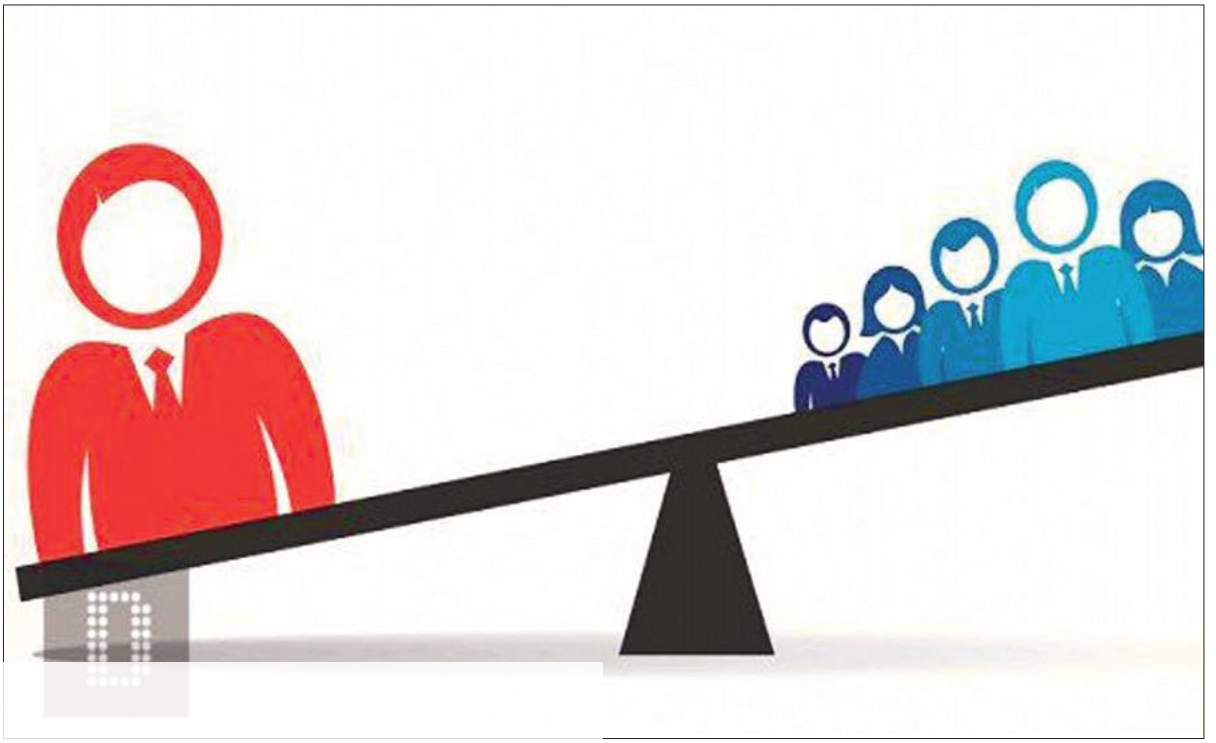

মহামারির মাঝে হু হু করে বাড়ছে কোটিপতি

দেশে ২০২০ সালে করোনার মাঝে যখন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ার খবর পাওয়া যাচ্ছিলো পুনঃপুন– তখনি বছরের মধ্যভাগে খবর প্রকাশিত হয়, কোটিপতির সংখ্যাও বেড়েছে মহামারিতে। এসময় প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ২০২০-এর একেবারে শুরুতে দেশে কোটিপতি সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৪ হাজারে। ২০১৯-এ বছর শেষের হিসাব এটা। আগের বছর ২০১৮ সালের শেষে সংখ্যাটি ছিল সাড়ে ৭৫ হাজার।

কেবল বাংলাদেশ ব্যাংকের আমানতের হিসাব থেকে কোটিপতির এ তথ্য পাওয়া গেছে। অন্যান্য সম্পদের হিসাব করলে সংখ্যাটি যে অনেক বাড়তো তা সহজেই অনুমেয়।

২০১৯-এর শেষে সর্বশেষ হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৮৩ হাজার ৮৩৯টি। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে কোটিপতি হিসাব ছিল ৭৫ হাজার ৫৬৩টি। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে কোটিপতি আমানতকারী বেড়েছে ৮ হাজার ২৭৬ জন। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর শেষে দেশে কোটিপতির হিসাব ছিল ৭৯ হাজার ৮৭৭টি। কেবল এরপরের তিন মাসে কোটিপতি বেড়েছে ৩ হাজার ৯৬২ জন।

অন্যদিকে, ২০২০-এর মার্চে কোটিপতি একাউন্ট ছিল ৮২ হাজার ৬২৫। তিন মাস পর জুনে, সেটা দাঁড়িয়েছে ৮৬ হাজার ৩৭ জন। অর্থাৎ তুমুল করোনার মাঝেই কোটিপতি একাউন্ট বেড়েছে ৩ হাজার ৪১২টি।

ব্যাংক আমানতের ৪৩ ভাগই কোটিপতিদের আমানত

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতে মোট আমানতকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি ৬৫ লাখ ৯৫ হাজার ২১১টি। এসব অ্যাকাউন্টে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ ১৪ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৪৩ দশমিক ৩৯ শতাংশই কোটিপতিদের আমানত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর শেষে এক কোটি এক টাকা থেকে পাঁচ কোটি টাকার আমানতকারীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৫ হাজার ৯১৯টি। বছরের ব্যবধানে এ অংকের হিসাব বেড়েছে ছয় হাজার ৬৬১টি। ২০১৮ সালে এটা ছিল ৫৯ হাজার ২৫৮টি।

২০১৯-এর ডিসেম্বর শেষে পাঁচ কোটি এক টাকা থেকে ১০ কোটির মধ্যে ৯ হাজার ৪২৬ জন, ১০ কোটি এক টাকা থেকে ১৫ কোটির মধ্যে তিন হাজার ১৮৪ জন, ১৫ কোটি এক টাকা থেকে ২০ কোটির মধ্যে এক হাজার ৪৭২ জন, ২০ কোটি

এক টাকা থেকে ২৫ কোটির মধ্যে ৯৯৭ জন, ২৫ কোটি এক টাকা থেকে ৩০ কোটির মধ্যে ৫৮৮ জন, ৩০ কোটি এক টাকা থেকে ৩৫ কোটি টাকার মধ্যে ২৪৬ জন এবং ৩৫ কোটি এক টাকা থেকে ৪০ কোটির মধ্যে ৩৮৪ জন আমানতকারী হিসাব রয়েছে। ২০১৯-এর এক বছরে ৪০ কোটি এক টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকার অ্যাকাউন্ট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮৪টি, যা ২০১৮ সাল পর্যন্ত ছিল ৩৫৮টি। এসব তথ্য সাক্ষী দিচ্ছে কোটিপতিদের সর্বোচ্চ স্তরে সম্পদ বৃদ্ধির ধারা তীব্র গতিতে অব্যাহত রয়েছে।

৫০ কোটির বেশি অর্থধারী একাউন্ট বেড়েছে ১৩৫টি

উপরোক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে ৫০ কোটি টাকার বেশি আমানত রাখা ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে এক হাজার ২৮৩ জনে দাঁড়িয়েছে। ২০১৮ সালে যা ছিল এক হাজার ১৪৮ জন। অর্থাৎ এক বছরে ৫০ কোটি টাকার বেশি হিসাবধারীর সংখ্যা বেড়েছে ১৩৫ জন।

বাংলাদেশে কোটিপতিদের সর্বাবস্থায় এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে বিশ্লেষকদের অভিমত প্রকাশ করেছে দৈনিক বাংলাদেশে প্রতিদিন ২০২০ সালের ২৫ জুন। সেখানে বক্তারা বলেছেন, দেশে করোনার পূর্ববর্তী সময়ে অর্থনীতির আকার ক্রমে বড় হচ্ছিলো। বাড়ছিল জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয়। এতে মানুষের সঞ্চয়প্রবণতাও বাড়ছিল। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুণগত মান না বাড়ায় সমাজের ছোট একটি শ্রেণির কাছেই বেশি সম্পদ ও অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছেন, সকল দেশেই কোটিপতির সংখ্যা বাড়াটা উন্নয়নের প্রতিফলন হিসেবে দেখা হয়। তবে একই সময়ে যদি মানুষের মধ্যে বৈষম্য বাড়তে থাকে তাহলে অবশ্যই এই উন্নয়ন ইতিবাচক প্রভাবের তুলনায় নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ২০২০-এর পূর্ণ তথ্য এই পরিসংখ্যানে আসেনি। কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের অর্থনীতিতে একটি সংকট তৈরি হয়েছে এসময়। মানুষ কাজ হারিয়েছে, দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। এ পরিস্থিতিতে কোটিপতিদের অ্যাকাউন্টগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের আবার খতিয়ে দেখা উচিত। তাতে হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাবে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আমরা চাইব দেশে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ুক। দেশে মানুষ যত বেশি সম্পদশালী হবে অর্থনীতি তত বাড়বে। সবাই ধনী হোক এটা সবাই চায়, কিন্তু এই সম্পদ যদি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হতে থাকে, মানুষে-মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য যদি আরও বেড়ে যায়, তাহলে সেটি উদ্বেগজনক। যেসব সূচক প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে বৈষম্য বাড়ার ইঙ্গিত মিলছে। এ ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদের যে বণ্টনগুলো হচ্ছে, সেই বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনের বিষয় যাতে গুরুত্ব পায়– সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এবং বাজেটে সে দিকগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোটিপতি অ্যাকাউন্ট বৃদ্ধির হার থেকে সাধারণভাবে এটা স্পষ্ট যে, একটি বিশেষ শ্রেণির কাছেই দিন দিন আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে। এতদিনকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল এই শ্রেণির মানুষরাই বেশি ভোগ করেছে। করোনাকালেও তাদের গায়ে দুঃসময়ের আঁচড় সামান্যই লেগেছে। এই পরিস্থিতি দেশে মানুষে-মানুষে বড় ধরনের বৈষম্যের কথাই জানাচ্ছে।

উল্লেখ্য, একটি দেশের আয়বৈষম্য পরিমাপের মানদন্ড হলো গিনি কো-এফিশিয়েন্ট। ২০০৮ সালে দেশে গিনি কো-এফিশিয়েন্ট ছিল ০.৩২ শতাংশ। ১০ বছর পর এসে তা বেড়ে ০.৪৯ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থনীতিবিদদের পরিভাষায় এটি 'উদ্বেগজনক'। পৃথিবীর কোথাও বা আশপাশের কোনো দেশে কো-এফিশিয়েন্ট এত বেশি নয়।

সারণী-১১: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় কোটিপতি হিসাব বৃদ্ধির ঐতিহাসিক ধারা
(খবরের সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন, ১৫ সে. ২০২০)

বছর	হিসাব সংখ্যা
১৯৭২	৫
১৯৭৫	৪৭
১৯৮০	৯৮
১৯৯০	৯৪৩
২০০১	৫১৬২
২০০৮	১৯১৬৩
২০২০ (জুন পর্যন্ত)	৮৬০৩৭

-

করোনাকালের নতুন পেশা

টিকে থাকার সংগ্রামে কর্মহারা মানুষ

মহামারির বছর হিসেবে ২০২০ সালে বিদ্যমান পেশা থেকে যেমন লাখ লাখ মানুষ চাকুরিচ্যুত হয়েছে– নতুন কিছু পেশাও তৈরি হয়েছে– যেখানে কিছু কিছু কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনেককে বিদ্যমান পেশা পাল্টাতেও হচ্ছে। বলা যায়, বেকার হয়ে পড়া বা আয় কমে যাওয়া এরকম মানুষরা মরিয়া হয়ে নতুন নতুন কিছু কাজের ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। বিভিন্ন সূত্রের বিবরণ দিয়ে প্রচার মাধ্যমগুলো চাকুরি বাজারের যে চিত্র দিচ্ছে তাতে অনুমান করা হচ্ছে বাংলাদেশে কাজ করার উপযোগী এবং কাজ খুঁজছে এমন মানুষ প্রায় দেড় কোটি। কিন্তু চাকুরি বাজারের পুরানো খাতগুলো বিপর্যস্ত হওয়ায় নতুন পেশার দিকে অনেকে মনযোগী হয়েছে।

কৃষি কাজে নতুন উদ্যম

করোনার সময় গ্রামীণ পুরানো কৃষিজীবীদের পাশাপাশি শিক্ষিত তরুণদের মাঝে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ বাড়তে দেখা গেছে। অনেকেই হাতেকলমে বুঝেছেন, কৃষি একটা মৌলিক খাত এবং বৈশ্বিক দুর্যোগে এই খাতই মানুষকে রক্ষা করেছে এবং এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও ভালো। কৃষিপণ্যের বাজারও বেশ চাঙ্গা। প্রায় সকল জেলাতেই কৃষিতে নতুন মেধা ও বিনিয়োগ হচ্ছে বলে খবর মিলছে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক কৃষি এবং জৈব কৃষির মাঝে তরুণরা নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন। জৈব কৃষিতে উৎপন্ন পণ্যের চাহিদাও শহরগুলোতে অনেক বেড়ে গেছে। এসব পণ্যকে ঘিরে কৃষি সামগ্রীর নতুন দোকান গড়ে উঠছে। অনেকে অনলাইনেও এসব পণ্য বিপননের উদ্যোগ নিয়েছেন। এতে গ্রামীণ উৎপাদকরা তাদের পণ্যের বিকল্প বাজার পাচ্ছেন।

অনলাইনে পণ্য সরবরাহকারী

নতুন পেশাসমূহের মাঝে সবচেয়ে এগিয়ে অনলাইনে জিনিসপত্র বাসাবাড়িতে সরবরাহের কাজ। করোনার আগেও এই পেশার অস্তিত্ব ছিল, তবে এতটা প্রসার ছিল না। বর্তমানে এটা বড় বড় শহরের একটা পরিচিত পেশা এবং এই পেশাজীবীদের সংখ্যাও বিপুল। শহরাঞ্চলে এই কাজে শত শত তরুণ-তরুণী ইতোমধ্যে শামিল হয়েছে। অনেকে নিজেরাই সংঘবদ্ধ হয়ে নতুন নতুন অনলাইন সরবরাহ কোম্পানি খুলেছে। পেয়াজ-মরিচ থেকে শুরু করে ওষুধ পর্যন্ত প্রায় সকল পণ্য এখন অনলাইনে সরবরাহ পাওয়া যায়। এরকম হোম-সার্ভিসের দুটি ধরন রয়েছে। কেউ যেমন পণ্য সরবরাহ করছেন, কেউ সার্ভিসও নিয়ে যাচ্ছে বাসাবাড়িতে।

ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে অনেকেই নিত্য দিনের প্রয়োজনে আগের মতো আর সেবা বিক্রেতাদের কাছে যেতে চাইছেন না। যেমন অনেকেই এপ্রিল-মে মাসে চুল কাটাতে দোকানে যাননি। মহামারির প্রথম কয়েক মাস এইরকম সেবা বিক্রেতারা পূর্ণাঙ্গভাবে বেকার ছিলেন। পরে তারা হোম সার্ভিসে লিপ্ত হন এবং আস্তে আস্তে তাদের পসার বাড়ছে। টেলিফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করেই এরকম কাজগুলো করা যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ নিজস্ব অ্যাপ চালু করেছেন। এতে তথ্য-প্রযুক্তি খাতেও কাজের চাহিদা ও চাপ বেড়েছে। সফটওয়্যার তৈরির অনেক সৃজনশীল উদ্যোগ বিকশিত হচ্ছে তরুণদের মাঝে। এরই পার্শ্বফল হিসেবে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ বিক্রি বেড়েছে। একই সঙ্গে বাড়ছে এসব যন্ত্র সারাইয়ের কাজের চাহিদা।

মাস্ক, স্যানিটাইজার ও সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবসা

করোনার দুঃসময়ে নতুন সৃষ্ট একটা লাভজনক ব্যবসা হলো মাস্ক, স্যানিটাইজার ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রি। কেউ কেউ নতুনভাবে আবার কেউ কেউ পুরানো কোন পেশা ছেড়ে এসব বিক্রিতে নেমেছেন। শহরগুলোতে বিভিন্ন রাস্তার ধারে এরকম পসরা সাজিয়ে বসা বিক্রেতাদের দেখা যায় নিয়মিত। যেকোন নতুন কাজ ও পেশাতেই শিক্ষানবীশ কাল থাকে কিছুদিন। যেহেতু এই ব্যবসাটি প্রায় পুরোপুরি নতুন এক ক্ষেত্র ছিল তাই অনেকেরই প্রথম ২-৩ মাস গিয়েছে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ধরন বুঝতে। আর বছরের মাঝামাঝি সময়টি ছিল দীর্ঘ এক বর্ষার মওসুম। ফলে অনেকেই রাস্তার ধারেকাছে ঘুচিয়ে শান্তিতে ব্যবসা করতে পারেননি। অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতির পরিবর্তনের উপর ভরসা করে এরকম ব্যবসায়ীরা ২০২১ সালের শুরুতে কিছু বাড়তি আয়ের আশা করছেন বলে দেখা গেল। সরকার মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করায় এবং করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গ আসায় মাস্ক তৈরি ও সরবরাহের কাজেও অনেক মানুষ যুক্ত হয়েছে।

ফেরিওয়ালাদের সংখ্যা বেড়েছে, চাহিদাও

সবজি ও মাছের জন্য মানুষ বাজারে যাওয়া কমিয়ে দেয়ার পরপরই এসব নিয়ে ভ্যানগাড়িতে দোকান সাজিয়ে পাড়াপাড়ায় শত শত নতুন ফেরিওয়ালা নেমে পড়েছেন। রাজধানী ঢাকায় ২০২০-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির চেয়ে নভেম্বর-ডিসেম্বরে এরকম ফেরিওয়ালা বেড়েছে অন্তত পাঁচ গুণ। অনেকেই এরা মহামারির সময় এই পেশায় এসেছেন– হয় নতুনভাবে কিংবা অন্য কোন কাজ ছেড়ে।

নতুন পেশাগুলো কী টেকসই হবে?

করোনাকালে সৃষ্ট নতুন পেশাগুলো বছর শেষেও টিকে থাকতে দেখা গেলেও– সকলের মনেই সংশয় দেখা গেছে, শেষ পর্যন্ত এগুলোর প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ থাকবে কি না। কেউ কেউ ভাবছেন মহামারির প্রভাব কমলে অনলাইনে জিনিসিপত্রের চাহিদাও কমে আসবে। পুরানো অভ্যাসবশত মানুষ হয়তো আবার সরাসরি দোকানপাটে যেয়ে কেনাকাটা করতে চাইবেন। তবে আপাতত দেখা যাচ্ছে, বাইরে ঘোরাঘুরি করে কেনাকাটা কিংবা খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস এখনও অনেকাংশে ফিরে আসেনি শহুরে সমাজে। এছাড়া ভাইরাসপ্রতিরোধী সুরক্ষায়ও মানুষের সতর্কতা অনেক পরিমাণে বহাল আছে। ফলে নতুন পেশাগুলো আপাতত অলাভজনক হয়ে পড়ার শঙ্কা নেই। আরও বহুদিন অনেক মানুষ বাজারে ঘোরার পরিবর্তে ঘরে বসেই পণ্য ও সেবা কিনতে চাইতে পারে।

তা ছাড়া এসব নতুন পেশাজীবীদের সামনে আপাতত বিকল্প কিছুও নেই। উদ্বেগের বিষয় হলো বছর শেষে করোনার প্রভাব কিছুটা বেড়েছে আবার। ফলে অর্থনীতি পুরো সচল হয়নি এবং বেকারত্বের ঢেউও থিতু হয়নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নতুন পেশা ও ব্যবসাগুলো টিকিয়ে রাখতে সরকারি বেসরকারি তরফ থেকে পুঁজি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দিয়ে এগুলোকে বাড়তি মদদ দেয়া দরকার। বিশেষ করে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণে এবং তথ্যপ্রযুক্তি সেবায় আগামীতে যে বিপুল সংখ্যক কর্মীর চাহিদা তৈরি হচ্ছে সেটার জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দরকার। এছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ কমানোও অনলাইনভিত্তিক কর্মজগতকে সহায়তার একটা বড় ক্ষেত্র। ইন্টারনেট সেবা বিক্রিকারীদের সঙ্গে জনস্বার্থে সরকারের বোঝাপড়া বাড়ানো দরকার এখনি।

-

ঢাকায় দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বাসস্থান সমস্যার কিছু সুরাহা হলেও স্যানিটেশন ও চিকিৎসা সুবিধা এখনও অপ্রতুল

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা এমডিজিতে বাংলাদেশ ভালো করেছিল। দারিদ্র্য প্রায় অর্ধেক কমিয়ে ফেলা গেছে। ফলে এসডিজিতে বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে বিশ্বের অনেকে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সামগ্রিক সফলতার পথে অন্যতম বাধা দেশের দরিদ্র দলিতদের অবস্থা। খোদ রাজধানী ঢাকাতে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট এরকম অনেক জনজাতি এখনও বসবাস করছে। কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্মীয় ভিন্নতাসহ এসডিজির দেশীয় নীতিনির্ধারকদের কাছে শনাক্ত হতে চাইছে এই দলিতরা।

ঝলমলে ঢাকার ভেতরই সেঁটে আছে কানপুরি, তেলেগু, রবিদাস, ঋষিসহ হরেক রকম দলিতের দারিদ্র্যগ্রস্ত জীবন। তারা আছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। আছে শহরবাসীর প্রয়োজনে। কিন্তু তাদের জন্য শহরবাসীর দায়-দায়িত্বের অঙ্গীকার দুর্বল। ২০২০-এও সেই দুর্বলতা কাটেনি।

অবাঙ্গালি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কলোনি আছে কয়েক শ' বছরের পুরানো এই শহরে ১৭টি। পাশাপাশি আছে রবিদাস ও ঋষিদের আরও ১৭ পাড়া-মহল্লা। সকলের জীবনধারাই দলিততুল্য। পেশা যদিও আলাদা। রবিদাস ও ঋষিরা সংখ্যায় ৬-৭ হাজার। জুতা তৈরি, সেলাই ও চামড়ার বিবিধ কাজ করে এরা। শিক্ষার সূত্রে ছড়িয়ে পড়ছে অন্য পেশাতেও।

ঢাকায় কানপুরি ও তেলেগু পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এই তেলেগু, কানপুরি, রবিদাস ও ঋষিরা 'দলিত' পরিচয়ে নিজেদের শনাক্ত করছে ইদানিং। অনেক এলাকায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা আছে 'হরিজন' পরিচয়েও। কোন কোন কলোনিতে হাজার পরিবার যেমন আছে তেমনি ৫-১০ পরিবারের খুদে মহল্লাও অনেক।

ঋষি ব্যাতীত কেউই এরা বাঙ্গালি নয়। বিশাল এই শহরে মূলধারার কাছে তারা ভাষা-সংস্কৃতিতে 'অপর'। অনেকখানি অচেনাও বটে। দেশজুড়ে এরকম মানুষ আছে প্রায় অর্ধকোটি। আওয়ামী লীগের ২০১৪ এবং ২০৮-এর নির্বাচনী ইশতেহারে এই দলিতদের স্বীকৃতি ছিল। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর ভাষণে দলিতদের জন্য সরকারের মনযোগের কথা বলেছেন কয়েকবার।

ভূমিহীনতা 'পিছিয়ে পড়া' এই মানুষদের জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য। কয়েক প্রজন্ম ধরে অবাঙ্গালি পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা এই রাজধানীতে আছে। ঢাকা দেশের প্রধান শহর হিসেবে গড়ে উঠতে পেরেছে তাদের সহায়তা পেয়েই।

বিভিন্ন জেলা থেকে আসা লাখ লাখ মানুষকে এ শহর বাসস্থানের নিজস্ব ঠিকানা দিয়েছে। কিন্তু দলিতদের অস্থায়ী এবং অতি-

অপরিসর কলোনি-জীবন শেষ হয় না কখনো। সরকারি খাসজমিতেই তাদের বসবাস-উচ্ছেদ-পুনর্বাসন। অনেক কলোনি কয়েকবার উচ্ছেদ হয়েছে। গণকটুলির কলোনিবাসীরা একদা ছিলেন ইডেন কলেজের চৌহদ্দিতে। গাবতলীর বাসিন্দারা ছিলেন মোহাম্মদপুর টাউন হল এলাকায়। ধলপুরের তেলেগুরা ওয়ারি ও সায়েদবাদ হয়ে ১৯৯০-এ এখানকার জায়গায় থিতু হলো।

রবিদাসরা কোথাও কোথাও সরকারিভাবে বরাদ্দ করা জমিতেই থাকছে। সেই ১৯৪৩ সালে ওয়ারিতে ২৮টি রবিদাস পরিবারকে একটা থাকার জায়গা দেয়া হয়েছিল ৯৯ বছরের লীজে। আজ ৭৭ বছর পর ২০২০ সালে ঐ কলোনিতে পরিবার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২০। জায়গা বাড়েনি। এর মাঝেই লীজের মেয়াদ শেষ হওয়া নিয়ে উৎকণ্ঠার শেষ নেই তাদের।

সরেজমিন দেখা গেল, সরকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ভবন বানাচ্ছে। ধলপুরে দুটি ভবন উঠেছে– ১২০টি পরিবার থাকতে পারবে। ওয়ারিতে ২৪০টি পরিবার থাকার মতো তিনটি ভবন হয়েছে। গণকটুলি ও গাবতলিতে অনেকগুলো বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে। নাজিরাবাজারেও দুটি ভবনের কাজ চলছে। এসব ভবনে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসন সমস্যা কিছুটা মিটবে। সবটা নয়। মানুষের তুলনায় ভবন কম। ধলপুরে নতুন বাড়িগুলোতে ১২০টি পরিবার থাকতে পারবে। কিন্তু সেখানে পরিবার আছে ২০৫টি। নাজিরাবাজারে এখনকার ৭০০ ঘরের বিপরীতে দুটি ভবনে জায়গা পাবে সর্বোচ্চ এক শ' পরিবার। বাকিদের থাকতে হবে পূর্বের দেড় রুমের ঘরেই। কারা নতুন ভবনে ঠাঁই পাবে– কারা পাবে না এই নির্দেশনা সুস্পষ্ট নয়।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা আবাসন সুবিধার জন্য লড়ছে কয়েক প্রজন্ম ধরে– সবাই মিলে। কিন্তু যেসব পরিবারের সিটি কর্পোরেশনের চাকুরিধারী কেউ নেই– তাদের নতুন বাসা বরাদ্দ পেতে বিড়ম্বনায় পড়ার শঙ্কা রয়েছে।

নাজিরাবাজারে অন্তত ১৬০টি পরিবার আছে যাদের পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সরকারি কাজ নেই। গণকটুলিতেও চাকুরি থাকাদের চেয়ে না-থাকাদের সংখ্যা বেশি। আজ ও আগামীতে নতুন ভবনে জায়গা পেতে এরকম পরিবারগুলো নীতিনির্ধারকদের আশ্বাস চাইছে।

দলিত কলোনিগুলোর ও স্বাস্থ্যচিত্র করুন। ছোট্ট একটি দলিত কলোনি রয়েছে গাবতলীতে। ৩০টি পরিবার থাকে। গোসলখানা আছে মাত্র একটি। সেটিও উন্মুক্ত। এখানেই বছরের পর বছর গোসল করছে নারী, পুরুষ, শিশু সকলে। টয়লেট আছে ৬টি। প্রতি পাঁচ পরিবার মিলে একটা টয়লেট। ২০৫ পরিবারের ধলপুর কলোনিতে কোন গোসলখানাই করা হয়নি। পুরো কলোনিতে ৩০টি গণটয়লেট আছে। তার সামনে যে চাপকল– সেখানেই গোসল করে পুরুষরা। নারীরা যার যার রান্নাঘরের থালাবাটি ধোয়ার জায়গায় বাহির থেকে পানি এনে কোনভাবে গোসল করে নেন। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বৃহত্তম কলোনি হিসেবে বিবেচিত নাজিরাবাজারে টয়লেট আছে ২০-২১টি। ১০-১২ হাজার মানুষের খাবার পানি সংগ্রহের জায়গা মাত্র একটি। পানি সংগ্রহের জন্য সেখানে রাতে এসে নারীদের লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়। ইচ্ছা থাকলেও এসব কলোনিতে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন দুরূহ। পেটের পীড়া, সর্দি-কাশি লেগে থাকে।

২২ নং ওয়ার্ডের গণকটুলি কলোনি-বাসিন্দাদের অজ্ঞাত কারণে কিডনীর সমস্যা ও ক্যানসার বাড়ছে। টাকার অভাবে প্রাথমিক অবস্থায় দরকারি চিকিৎসাটুকু শেষ করতে না পেরে মৃত্যুর মুখে পড়ছেন অনেকে। গর্ভবতী নারীদের চিকিৎসায় সাড়ে পাঁচ শ' পরিবারের এই কলোনিতে সংকটের কথা জানালেন প্রায় সকলেই। নবজাতকদের টীকায়ও ব্যাঘাত ঘটছে। ধলপুরের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বড় স্বাস্থ্য-সমস্যা ডেঙ্গুর আধিক্য।

দলিত পরিবারগুলোতে গত দুই দশকে সবচেয়ে ইতিবাচক দিক শিক্ষার প্রসার। বাবা হয়তো কোথাও রোদ-বৃষ্টিতে বসে জুতা সেলাই করেন– কিন্তু সন্তানকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন। তবে কলোনির চরম ঘনবসতিতে বইয়ে মনসংযোগ কঠিন। প্রতিটি কলোনিতে নভেম্বর-ডিসেম্বর এলেই মাইক বাজিয়ে বিয়ের ধুমধাম শুরু হয়। এসময়ই থাকে শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক পরীক্ষা। কিশোর-কিশোরীদের ভাষায় 'কলোনিতে পড়ার পরিবেশ নাই।' পাশাপাশি 'গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষার ঘাটতি'র কথা জানালেন ধলপুরের তেলেগু স্কুলের সভাপতি এ যোশেফ দাস। একই আফসোস নাজিরাবাজার কলোনির 'হরিজন সংগঠক' গগন লালের।

এসব কারণে কলোনির কিশোর-কিশোরীরা স্কুলের পরীক্ষায় পাস করলেও ভালো 'গ্রেড' পায় না। শিক্ষার পরের ধাপে ঢুকতে সমস্যা হয় এতে।

২০১৩ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিতদের জন্য কোটার ব্যবস্থা হওয়ায় শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে সর্বত্র। সেই কোটা এখনও আইনী মর্যাদা পাওয়ার সংগ্রামে আছে এবং এখনও প্রাথমিক পর্যায়ের দলিত শিক্ষার্থীর ১-২ ভাগের বেশি স্নাতক স্তর ডিঙ্গাতে পারছে না। অভাব রয়েছে গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষার। বেকারিও ভয়াবহ। শিক্ষাজীবন শেষে মানানসই কাজ না পাওয়ায় শিক্ষার আবেদন খর্ব হচ্ছে। গণকটুলিতে রূপালি রাণী দাসের সঙ্গে পরিচয় হলো। তারা দুই বান্ধবী ইডেন থেকে ব্যবস্থাপনায় এম কম। উভয়ে বেকার। তাদের মতো তরুণ-তরুণী সেখানে অনেক।

তারপরও ওদের চোখে অতীতকে অতিক্রমের স্বপ্ন। ২০ ফুট গুন ১২ ফুটে'র ঘরগুলোতে পরিবারের অনেক সদস্যের মাঝেই একটু জায়গা তৈরি করে তেলেগু, কানপুরি শিশু-কিশোররা পড়ছে।

তবে যত উচ্চশিক্ষিত হোক দলিত কলোনির ছেলে মেয়েদের জন্য পরিচ্ছন্নতার কাজ ছাড়া অন্যকিছুর কথা ভাবতে অভ্যস্ত হয়নি দেশের 'মূল সমাজ' আজও। এরকম পরিবারগুলো থাকার সরকারি জায়গায় টিকে থাকতে যেকোনভাবে সিটি কর্পোরেশনের ময়লা পরিষ্কারের কাজ চায়। সেই চাকুরি পেতে '৪-৫ লাখ টাকা লেগে যায়' বলে অভিযোগ। কখনো কখনো এসব লেনদেন ছাড়াও চাকুরি হচ্ছে। সেটা সংখ্যায় বেশি নয়। ঢাকা-দক্ষিণে সম্প্রতি অনেকের 'মশককর্মী'র চাকুরি পেতে 'কিছু লাগেনি'। এটা বড় ব্যতিক্রম ছিল।

অনেক দাম দিয়ে 'চাকুরি কেনা' এই মানুষদের জন্য সহজ নয়। ফলে শহরের ময়লা পরিষ্কারের কাজে অতীতের একচেটিয়াত্বে নেই আর পুরানো 'সুইপার সমাজ'। পূর্বপুরুষের এই পেশাগত পরম্পরায় নিজেদের বাড়তি হিস্যা চায় এই সম্প্রদায়। কিন্তু ঢাকায় এই কাজের ৮-১০ হাজার কর্মীর মাঝে তাদের সংখ্যা ইতোমধ্যে ১২-১৩ শ'তে নেমে গেছে বলে অনুযোগ সবার। ধলপুর কলোনি ঘুরে দেখা গেল সেখানকার ২০৫টি পরিবারের ৭২টিতে সিটি কর্পোরেশনে কাজ করা মানুষ আছেন। বাকিরা বেসরকারি নানান প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কাজ করে। করোনায় তাদের সেই কাজ কয়েক মাস বন্ধ। পায়নি মজুরিও। রবিদাস জনগোষ্ঠীতে অনেক নারী থেরাপির (ম্যাসেজ করা) কাজ করে ভালো আয় করতো। করোনায় সেই আয়ও বন্ধ। পুরুষরা অনেকে জুতার কাজ ছেড়ে স্যালুন দিয়েছিল। করোনায় সেখানেও মন্দা যাচ্ছে।

দলিত কলোনিতে সবচেয়ে বিপন্ন দশা নারীর। ঘরবন্দি জীবন অধিকাংশের। পুরুষরা নারীদের 'মহল্লার বাইরে' যেতে দিতে নারাজ। কোথাও কোথাও সেসব প্রথা ভাঙ্গছে ধীরে ধীরে। নাজিরাবাজারে এখনও পরিবর্তনের ঢেউ অতি মৃদু। সেখানে মাদকের সমস্যা আর তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে নারী নির্যাতনের কথাও জানালেন কয়েকজন তরুণী। ধলপুরেও অন্তত ৩০ ভাগ পুরুষের মাঝে মদ পানের অভ্যাস রয়ে গেছে। নারী নিপীড়ন এখনও কলোনিগুলোতে 'ঘরের নিজস্ব ব্যাপার' হয়ে আছে।

তেলেগু, কানপুরি, রবিদাস, ঋষি অনেকেই সনাতন ধর্মাবলম্বী হলেও পূজা-পার্বনে মূলধারার মন্দিরে উচ্চবর্ণের তরফ থেকে সমানাধিকার পেতে সমস্যা বাঁধে। নীরব ছায়া বিস্তার করে থাকে অস্পৃশ্যতার অতীত। তবে সমাজের নীচুতলায় সেটার প্রকোপ কমছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি এসব জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষায় জরুরি হয়ে পড়েছে সাংস্কৃতিক একাডেমি করা। সকল দলিতদের জন্য একটি হলেও তেমন কিছু হতে পারে ঢাকায়। সিটি কর্পোরেশন প্রথাগত কাজের বাইরে এরকম কোন উদ্যোগ নিতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে অনেক নৃগোষ্ঠীর জন্য যেমনটি রয়েছে।

নিজস্ব ভাষা টিকিয়ে রাখতে ঢাকার এই শ্রমজীবী পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কয়েকটি কলোনিতে দেখা গেল তেলেগু বয়োজ্যেষ্ঠদের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবী চেষ্টা। ভাষাগুলোর শেখাপড়া বাড়াতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপের সুযোগ আছে। দায়িত্বও আছে। বহুভাষী মানুষের রাজধানী বাংলাদেশের গৌরব বাড়াতে পারে।

- আলতাফ পারভেজ

-

শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়ছে; মামলার জট কমছে না

শ্রমজীবীদের পেশাগত সংকটের প্রতিকার পাওয়ার জায়গা শ্রম আদালত। এর দুটি স্তর রয়েছে বাংলাদেশে। প্রথমে যেতে হয় শ্রম আদালতে। তারপর প্রয়োজন হলে শ্রম আপিল আদালতে। আদালতের রায়ের ৬০ দিনের মধ্যে আপিল আদালতে যেতে হয়। মালিক-শ্রমিকরা সেখানেও যাচ্ছে। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য শ্রম আদালতে একটা সমস্যা হলো তারা বঞ্চনার দ্রুত প্রতিকার পাচ্ছে না। একদিকে আদালতের অপ্রতুলতা, অন্যদিকে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা এ অবস্থার এক বড় কারণ।

বর্তমানে শ্রম আদালতে পাঁচ বছরের পুরানো সহস্রাধিক মামলাও চূড়ান্ত ফয়সালার অপেক্ষায় রয়েছে। ২০২০-এর ১ মে ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, শ্রম আদালতে, আপিল আদালতসহ প্রায় ১৯ হাজার মামলা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। এর মাঝে ঢাকায় রয়েছে প্রথম শ্রম আদালতে ৪ হাজার ৯৬১টি মামলা, দ্বিতীয় শ্রম আদালতে ৫ হাজার ৬৭৪টি মামলা এবং তৃতীয় শ্রম আদালতে ৪ হাজার ৩০৮টি মামলা। এছাড়া উল্লিখিত সময়ে চট্টগ্রামের প্রথম শ্রম আদালতে ছিল ১ হাজার ৫০০ মামলা, চট্টগ্রামের দ্বিতীয় শ্রম আদালতে ছিল ৬০০ মামলা, খুলনায় ছিল ৩০০ মামলা, রাজশাহীতে ছিল ৫৫০ মামলা, শ্রম আপিল আদালতে ছিল ১ হাজার ১০২টি মামলা এবং হাইকোর্টে চলছিল ২৭৯টি মামলা। এসব মামলার একাংশ পাঁচ বছরেরও অধিক আগে দায়েরকৃত।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত প্রতিবেদনের ঠিক এক বছর পূর্বে ২০১৯-এর ১ মে ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে শ্রম আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা দেখা গিয়েছিল ১৭ হাজার ৬০০। অর্থাৎ এক বছরে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা প্রায় দেড় সহস্রাধিক বেড়ে গেছে।

সারণী-১২: ডেইলি স্টার এবং বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এর যথাক্রমে ১ মে ২০১৯ এবং ১ মে ২০২০ এর প্রতিবেদনের আলোকে পুরানো সাতটি শ্রম আদালতে বিদ্যমান মামলার চিত্র

আদালত	মামলার সংখ্যা ২০১৯	মামলার সংখ্যা ২০২০
ঢাকার প্রথম শ্রম আদালত	৪৫৭৬	৪৯৬১
ঢাকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত	৫২৬৩	৫৬৭৪
ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত	৪০০৫	৪৩০৮
চট্টগ্রামের প্রথম শ্রম আদালত	১৫১০	১৫০০
চট্টগ্রামের দ্বিতীয় শ্রম আদালত	৫৭৮	৬০০
শ্রম আদালত, খুলনা	২১৪	৩০০
শ্রম আদালত, রাজশাহী	৪১৫	৫৫০

বলাবাহুল্য, করোনার কারণে শ্রম আদালতে মামলা নিষ্পত্তির এই দীর্ঘসূত্রিতা আরো বেড়েছে। উপরে উল্লিখিত দৈনিকে ২০২০ এর ১ মে'র প্রতিবেদনে এমনও নজির তুলে ধরা হয়েছে, ৮০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের একটা মামলা আট বছর ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে এক আদালতে। হায়দার আলী নামের এই শ্রমিক নারায়ণগঞ্জের একটা পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। সেখানে তাঁকে নিয়ম না মেনে বরখাস্ত করা হলে তিনি পুনর্নিয়োগ ও ক্ষতিপূরণ চেয়ে ঢাকার শ্রম আদালতে ঐ মামলা দায়ের করেছিলেন ২০১২ সালে। এই শ্রমিকের গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ। এখন কর্মহীন অবস্থায় ৮০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের একটা মামলার জন্য আট বছর ধরে তাকে ঢাকা আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। মামলার বাদি প্রভাবশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোনভাবেই পেরে উঠছেন না হায়দার আলী। নানা অজুহাতে মালিকপক্ষের আইনজীবী শুনানিতে সময় বাড়িয়ে নিচ্ছেন। এরকম দৃষ্টান্ত শ্রম আদালতগুলোতে অনেক।

সিলেটে ও রংপুরে নতুন শ্রম আদালত চালু হলো

শ্রম অঙ্গনে এ বছর একটা ভালো খবর ছিল শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি। সিলেটে নতুন করে একটা আদালত বসতে শুরু করেছে বছরের শুরু থেকে। পাশাপাশি রংপুর এবং বরিশালেও শ্রম আদালতের কার্যক্রম শুরু হয় এ বছর। ফলে ঐ সব জেলা এবং সন্নিহিত আরও কিছু জেলার শ্রমজীবীদের পেশাগত বঞ্চনার প্রতিকার পাওয়া সহজ হবে বলে আশা করা যায়। সিলেট বিভাগের চারটি জেলায় শ্রমজীবী জনসংখ্যা প্রচুর হলেও পূর্বে তাদের আইনী প্রতিকারের জন্য চট্টগ্রামে যেতে হতো।

তবে নতুন আদালতগুলো স্থাপিত হলেও বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্যানেল গেজেটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়নি। উল্লেখ্য, শ্রম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় মূল বিচারক ছাড়াও এসব প্রতিনিধি প্যানেলের সদস্যের সময়মতো উপস্থিতি ও পরামর্শের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

আইন অনুযায়ী জেলাজজ পদমর্যাদার চেয়ারম্যান এবং দুজন সদস্যের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হয়। তবে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু চেয়ারম্যান একা নন, বাকি দুই সদস্যেরও উপস্থিতি দরকার হয়। কখনো কখনো ঐ দুই সদস্যের একজন উপস্থিতি থাকেন না। সে কারণেও মামলা পড়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণগত জটিলতা

শ্রম আদালত ও আপীল আদালতের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ শ্রম মন্ত্রণালয়। তবে সংবিধান অনুযায়ী সকল অধস্তন আদালত দেখাশোনার দায়িত্ব দেশের সুপ্রিম কোর্টের। আদালতের এই দুই ধরনের কর্তৃপক্ষ থাকায় এর জনবল নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিলম্ব ঘটে। যেমন, সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে শ্রম আদালত স্থাপনের প্রজ্ঞাপন ২০১৯-এর জুনে হলেও দেখা গেল সিলেটে আদালতের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০২০-এর ফেব্রুয়ারিতে।

আদালতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আর বিচারক নিয়োগের বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে। ফলে একধরনের দ্বৈততা আছে এখানে। আবার আদালত ভবনগুলোর দৈন্যদশা, ক্যানটিন বা শৌচাগারের অভাব বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত হওয়ার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

এইরূপ বিলম্ব ছাড়াও কারখানা মালিকরা শ্রম আদালতের অনেক মামলার বিপরীতে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করেও শ্রমিকদের আইনগত প্রতিকার পাওয়ার চেষ্টা বিলম্বিত করছে। যদিও প্রাথমিকভাবে নিয়ম রয়েছে শ্রম আদালতে মামলা দায়েরের ষাট দিনের মধ্যে সেগুলো নিষ্পত্তি হবে। এই সময়সীমার মধ্যে নিষ্পন্ন না হলে আরও ৯০ দিন সময় বাড়ানোর নিয়ম রয়েছে। কিন্তু মালিকরা বার বার সময় চেয়ে বিচার কাজ আরও অনেক দীর্ঘদিন প্রলম্বিত করে দেন। শ্রম আইনের কিছু দুর্বলতা বা অস্পষ্টতাও এই বিলম্বকে উৎসাহিত করছে।

তবে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মামলা নিষ্পত্তিতে প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে অনেক সময়ই উভয়পক্ষকে বিবাদিত বিষয় সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। শ্রমিক সংগঠকদের দাবি অবশ্য আদালতের সংখ্যা আরও বাড়ানো। তাঁদের মতে ১৯৭২ সালে যখন দেশে শ্রমিক সংখ্যা ছিল কমবেশি ১০ লাখ তখন আদালত ছিল ছয়টি। আর এখন সেই শ্রমিক অন্তত ৬০ গুণ বেড়েছে। কিন্তু আদালতের সংখ্যা দ্বিগুণও হয়নি।

এ বিষয়ে শ্রম বিশেষজ্ঞ সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, 'যদি ময়মনসিংহের কোন চাতালের একজন শ্রমিক তাঁর দেনমোহরের দাবি করতে চান, তবে তিনি সেখানেই এর প্রতিকার পেতে পারেন। সেই শ্রমিকই যখন তাঁর মালিকের কাছে পাওনাসংক্রান্ত কোনো দাবি করতে চান, তবে তাঁকে ঢাকায় আসতে হবে। আমাদের দেশে যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন কম শক্তিশালী, সেখানে আইনের আশ্রয় নেওয়ার জন্য শ্রমিকের শেষ জায়গা আদালত। সেখানে যদি তাঁকে এত দীর্ঘসূত্রিতার কোপানলে পড়তে হয়, তবে তা হতাশাজনক।'

-

চুড়িহাট্টা আগুনের দু'বছর: পুরানো ঢাকা থেকে সরেনি রাসায়নিকের গুদাম

পুরাতন ঢাকার চকবাজারের ওয়াহেদ ম্যানশনে টেলিকম ব্যবসা করতেন সহোদর মাসুদ রানা (৩৪) ও মাহবুবুর রহমান রাজু (২৮)। দুই ভাইয়ের উপার্জনে চলতো পরিবার। চুড়িহাট্টার ওই ভবনে আগুন লাগার মাত্র ২৬ দিন আগে বিয়ে করেছিলেন রাজু। আর বড় ভাই রানার ঘরে ছিল চার বছর বয়সী শিশু পুত্র ও স্ত্রী। ওয়াহেদ ম্যানসনের ভয়াবহ আগুন কেড়ে নেয় দুই ভাইয়ের প্রাণ। ভস্মিভুত হয়ে যায় দোকানের ২৬ লাখ টাকার মালামাল।

ওয়াহেদ ম্যানসনের আগুন রানা-রাজুর পরিবারে অপূরণীয় ক্ষতি করে গেলেও আজও সরকারি সহায়তা পায়নি পরিবারটি। ফলে করোনা সংকটে আর্থিক দুর্দশায় পড়েছেন রানা-রাজুর বৃদ্ধ বাবা মোহাম্মদ সাহেবউল্লাহ। গত ১০ অক্টোবর চকবাজারে কথা হয় তার সঙ্গে। কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, রানার ঘরে এক ছেলে, রাজুর ঘরেও একটা ছেলে হইছে। আমি বুড়া মানুষ। ছেলেরা মারা যাওয়ার পর কিডনি নষ্ট হইছে। দিনে ৩০০-৪০০ টাকার ঔষধ লাগে। স্ত্রীর অবস্থাও খারাপ। পরিবারে উপার্জনের লোক নাই। ছোট ছেলেটারে ১২দিনের মধ্যে চাকরি দিতে চাইছিল মেয়র। কিন্তু দুই বছরেও ১২দিন যাচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান ক্ষতিগ্রস্তরা

২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ওয়াহেদ ম্যানশনসহ ৫টি ভবন পুরোপুরি ভস্মিভূত হয়। আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান ৭১ জন। আহত হন অনেকে। আগুনে পুড়ে ক্ষতি হয় লাখ লাখ টাকার মালামাল। জানা যায়, মর্গ থেকে লাশ হস্তান্তরের সময় জেলা প্রশাসন থেকে যে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এর বাইরে অধিকাংশ পরিবারই কোনো সহায়তা পায়নি। ঘটনার পরপরই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) তৎকালীন মেয়র সাঈদ খোকন পরবর্তী ১২ দিনের মধ্যে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির একজন করে স্বজনকে চাকরি দেয়ার আশ্বাস দেন। সেই অনুযায়ী ২১ জন নিহত ব্যক্তির স্বজনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে সিটি করপোরেশনের বর্জ্য বিভাগে চাকরি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চার জনকে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দেয়ার পরও দেয়া হয়নি। যা নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এমনকি যারা চাকরি পেয়েছেন তারাও অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন।

নিহতদের পরিবারগুলোর দাবি অগ্নিকাণ্ডের পরপরই ক্ষতিগ্রস্ত ও নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে পুনর্বাসন ও আর্থিক সহায়তা দিতে প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে বেশ কয়েকটি ব্যাংক অনুদান

দেয়। এই অর্থের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটি। যেটি পাওয়ার জন্য চুড়িহাট্টা অগ্নিকান্ডে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংস্থা নামে একটি সংগঠন আন্দোলন করে যাচ্ছে। বিষয়টির সুরাহার জন্য তারা এখন প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চাইছেন। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (৭০) এই দুর্ঘটনায় নিজের একমাত্র ছেলে অসিউদ্দিন মাহিতকে হারিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা কেউই ক্ষতিপূরণ চাই না, চাই মানবিক সহায়তা। প্রধানমন্ত্রী চাইলে আমাদের টাকাটা দিয়ে দিতে পারেন। এই করোনায় আমরা যে কষ্টে আছি তা ব্যাখ্যা করার মতো না। আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চাই।

অগ্নিকান্ডে নিহত জুম্মন মিয়ার ছেলে রাশেদ খান বলেন, মেয়র সাঈদ খোকন ২১ জনরে সিটি করপরেশনে অস্থায়ী চাকরি দিছে। কাজ করলে টাকা আছে না করলে নাই। আমাদের চারজনকে দিতে চেয়েও দেয়নি। এর মধ্যে মেয়র বদলাইছে। আমরা ঘুরেই যাচ্ছি কাজ হচ্ছে না, হয়রানির শেষ নাই। সাহেবউল্লাহ জানান, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নীলক্ষেতে দোকান দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দেয়। সেজন্য তার কাছ থেকে তিন লাখ টাকাও নেয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই দোকান পাননি। নীলক্ষেতে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে মার্কেটে দোকান দেয়ার কথা সেটি এখনো তৈরিই হয়নি।

জানা যায়, চলতি বছরের এপ্রিলে শ্রম অধিদপ্তর থেকে ২৮ জন নিহতের পরিবারকে ২ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। যেসব নিহতের পরিবার এই ক্ষতিপূরণ পায়নি তারা শ্রম অধিদপ্তরে যোগাযোগ করলেও কোনো সদুত্তর পাননি। ক্ষতিগ্রস্ত এমন চারটি পরিবারকে ২ লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে চুড়িহাট্টা মসজিদ কমিটি, পুরান ঢাকার প্লাস্টিক ব্যবসায়ী সমিতি থেকে আলাদা আলাদাভাবে কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

সংস্কার কাজ চলছে ওয়াহেদ ম্যানসনের

গত ১০ অক্টোবর চুড়িহাট্টা এলাকায় দেখা যায়, পুড়ে যাওয়া ওয়াহেদ ম্যানসনের ওপরের তলাগুলোতে এখনো পুড়ে যাওয়ার চিহ্ন। ভবনের দোতলায় একটি সাইনবোর্ড। তাতে লেখা ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আদেশক্রমে ওয়াহেদ ম্যানশন বিল্ডিংয়ের রেট্রোফিটিং কাজ চলছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান শহিদুল্লাহ এন্ড নিউ এ্যাসোসিয়েটস। এরই মধ্যে ভবনের নিচতলার অন্তত ১০টি দোকান নতুন করে সিমেন্ট, বালু ও ইট দিয়ে সংস্কার করা হয়েছে। দোকানও বসেছে কয়েকটি। ভেতরের দোকানগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজও চলছে। ভবনটির দ্বিতীয় তলার একটি অংশের দেয়াল বিস্ফোরণে ছিটকে গিয়েছিল সেই অংশ সংস্কার করার জন্যও রাখা হয়েছে বাড়তি ইট।

তবে এ বিষয়েও এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে। তাদের দাবি ভবনটি ভেঙ্গে নতুন করে নির্মাণ করা হোক। জানা যায়, ওয়াহেদ ম্যানশনের দুই মালিক হাসান ও সোহেল জেলে যাওয়ার পর সোহেলের শ্যালক রুবেল গত জুন মাসের দিকে ভবনটি সংস্কারের কাজ শুরু করে। এতে এলাকাবাসী প্রথমে বাধা দিলে তারা সিটি করপোরেশনের একটি অনুমতির কাগজ দেখিয়ে সংস্কার কাজ চালিয়ে যায়।

জানতে চাইলে সোহেলের শ্যালক রুবেল বলেন, অগ্নিকাণ্ডের এক মাস পরে সিটি করপোরেশন, রাজউক, বুয়েট, ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় প্রতিনিধিসহ ১২টি সংস্থাকে নিয়ে একটি কমিটি করে দেয়। সেই কমিটি ভবনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ডিএ টেস্ট করাতে বলে। শহিদুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিংকে দিয়ে আমরা সেটা করাই। এরপর যেসব স্থানে সমস্যা দেখা দেয় সেখানে কমিটি রেট্রোফিটিং করতে বলে। সে অনুযায়ী আমরা দেশের এক নম্বর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কাজটি করছি। কাজ শেষে আবার আমরা সিটি করপোরেশনে যাবো তারপর তারা ছাড়পত্র দিলে তখন ভবনের কার্যক্রম চালানো যাবে। তিনি বলেন, ডিএ টেস্টের সময় ভবনের তিনটি বিম ও কলামে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাদ বাকি সব ঠিক আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খায়রুল বাকের বলেন, ভবনটির ভাগ্য নির্ধারণে সিটি করপোরেশন ১২ সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি করে দেয়। সেই কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী কাজ চলছে। আমাদের সিটি করপোরেশনের অঞ্চল-৩ (আজিমপুর) এর প্রকৌশলীরা এর দেখভাল করছে।

চকবাজার চুড়িহাট্টায় আগের মতই ব্যবসা, বাণিজ্য, সব কাজকর্ম চলছে। অথচ আমাদের কথা সবাই ভুলে গেছে। তারা প্রভাবশালী। এজন্য হয়তো মামলার চার্জশিট বার বার পেছাচ্ছে। এছাড়া আমার ছোট ভাইকে সিটি করপোরেশনে একটা চাকরি দেয়ার কথা ছিল। আজ পর্যন্ত সেটা হলো না। আমরা আর কত হয়রান হবো?

তবে তারা এমন কথা বললেও সম্প্রতি গণমাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস গণমাধ্যমকে বলেন, ওয়াহেদ ম্যানসন সংস্কারে কাউকে অনুমতি দেয়া হয়নি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলবেন বলে সেদিন জানিয়েছিলেন মেয়র। এ বিষয়ে তার বক্তব্য জানতে মেয়রের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তিনি ধরেননি। এ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামাল উদ্দিন কাবুল বলেন, চুরিহাট্টার ঘটনার সময় আমি এখানে কাউন্সিলর ছিলাম না। নতুন কাউন্সিলর হিসাবে এবারের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছি। ওয়াহেদ ম্যানশনের নতুন করে যে কাজ করা হচ্ছে এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানায়নি তারা। কিভাবে সিটি করপোরেশনের অনুমতি না নিয়ে এই ঝুকিপূর্ণ কাজ করছে তা মেয়রকে জানাবো। তিনি আরও বলেন, চুরিহাট্টায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহযোগিতার বিষয়ে সিটি করপোরেশনকে অবগত করবো বলে জানান তিনি।

বার বার পেছাচ্ছে চার্জশিট

ওয়াহেদ ম্যানসনে অগিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত জুম্মন মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ আসিফ বাদী হয়ে চকবাজার থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এরইমধ্যে ঘটনার এক বছর ৯ মাস অতিবাহিত হলেও দেয়া হয়নি চার্জশিট। এ পর্যন্ত মোট ১২ বার চার্জশিট দেয়ার তারিখ পিছিয়েছে। আগুনের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় বলা হয়েছে, 'ওয়াহেদ ম্যানশনের মালিকের দুই ছেলে মো. হাসান ও সোহেল ওরফে শহীদ তাদের চারতলা বাড়ির বিভিন্ন ফ্লোরে দাহ্য পদার্থ রাখতেন। মানুষের জীবনের ঝুঁকি জেনেও অবৈধভাবে রাসায়নিকের গুদাম করার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছে বাসা ভাড়া দেন। আর ওই দাহ্য পদার্থ থেকেই আগুন লাগে। যদিও প্রথমে প্রচারের চেষ্টা করা হয়েছিলো, রাস্তায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন লাগে। বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণের কাহিনীও ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল।

মামলার এজাহারভুক্ত আসামি দুই ভাই হাসান ও সোহেল গ্রেপ্তার হলেও পরে উচ্চ আদালত থেকে তারা জামিন পান। পুলিশ বলছে, গোডাউনের অন্য মালিকদের ঠিকানা নিশ্চিত হতে না পারায় তাদের এখনো আইনের আওতায় আনা যায়নি। চুড়িহাট্টা মসজিদের আশেপাশের বাড়িগুলোতে ছিল রাসায়নিক দ্রব্যের গোডাউন। রাস্তায় বিস্ফোরিত একটি গাড়ি থেকে প্রথমে রেস্টুরেন্টে, তার পরে আশেপাশের ভবনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

আসিফ হোসেন বলেন, অপরাধীরা জামিনে আছে। চকবাজার চুড়িহাট্টায় আগের মতই ব্যবসা, বাণিজ্য, সব কাজকর্ম চলছে। অথচ আমাদের কথা সবাই ভুলে গেছে। তারা প্রভাবশালী। এজন্য হয়তো মামলার চার্জশিট বার বার পেছাচ্ছে। এছাড়া আমার ছোট ভাইকে সিটি করপোরেশনে একটা চাকরি দেয়ার কথা ছিল। আজ পর্যন্ত সেটা হলো না। আমরা আর কত হয়রান হবো? এ বিষয়ে চকবাজার থানার তদন্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন বলেন, শুরুতে আমি দায়িত্বে ছিলাম না। এ কথা সত্যি একটু সময় লাগছে। তবে তদন্ত শেষ না হলে তো আর দেয়া যায় না। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত চার্জশিট দিয়ে দেয়ার।

ঘুষ ও রাজনৈতিক প্রভাবে রাসায়নিক কারখানার লাইসেন্স অব্যাহত

চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের ওপর গত আগস্টে মাসে এক বিশদ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। 'নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর: পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে টিআইবি জানায়, পুরানো ঢাকায় অগ্নি দুর্ঘটনা এড়াতে রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম স্থাপনে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ রাখা হলেও সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতির কারণে এটি এখনো অব্যাহত আছে। সংস্থাটি বলছে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিসে মোটা অঙ্কের ঘুষ লেনদেন এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রাসায়নিক ব্যবসা করে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এতে বার বার অগ্নি দুর্ঘটনায় পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে।

টিআইবির গবেষণাটি গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে করা হয়। এতে বলা হয়, ২০১৮ সালে পুরানো ঢাকার লালবাগ, হাজারীবাগ, সদরঘাট ও সিদ্দিকবাজার এলাকায় অন্তত ৪৬৮টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। ২০১০ সালে নিমতলী ট্রাজেডির পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটি পুরান

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিক বা নিহত শ্রমিকের পরিবার আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবে এটা তাদের অধিকার, কারো করুণা বা দয়া নয়।

- সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

ঢাকা থেকে কেমিক্যাল গোডাউন অপসারণসহ ১৭টি সুপারিশ করে। পাশাপাশি উচ্চ আদালত থেকেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেয়া হয়। তবে এসব সুপারিশ ও নির্দেশনার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে তা পর্যালোচনার আগেই ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে চকবাজারের চুড়িহাট্টায় অগ্নিকান্ড ঘটে। যাতে প্রাণ হারান ৭০ জন। এই দুর্ঘটনার পর গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, পুরানো ঢাকায় এখনো ১৫ হাজারের বেশি কেমিক্যাল গোডাউন রয়েছে।

আমাদের অনুসন্ধানেও এর সত্যতা জানা গেছে। অধিকাংশ কেমিক্যাল ব্যবসায়ী রাতের আধারে গোডাউনে কেমিক্যাল আনা নেওয়া করেন বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। টিআইবির প্রতিবেদনে বলা হয়, লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরে ২০-৩০ হাজার, বিস্ফোরক অধিদপ্তরে দেড় লাখ থেকে আড়াই লাখ, ফায়ার সার্ভিসে ৩-১২ হাজার, সিটি করপোরেশনে দেড় হাজার থেকে ১৮ হাজার টাকা ঘুষ লেনদেন হয়। এছাড়া কেমিক্যাল ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বিভিন্ন সংস্থাকে মাসিক ভিত্তিতে চাঁদা দিয়ে থাকে।

গবেষণায় আরও বলা হয়, পুরান ঢাকায় কোন ভবনে কত কেমিক্যাল গোডাউন আছে, কী কী কেমিক্যাল, পরিমাণ কত এসব কোনোটিরই কোনও পরিসংখ্যান বা ডাটা সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোর কাছে নেই। নিমতলী ও চুড়িহাট্টায় অগ্নিকান্ডের পর তদন্ত কমিটি যেসব সুপারিশ করেছে তাও মানা হয়নি। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় মামলা হলেও অভিযুক্তরা সাজা পায় না বলেও গবেষণায় জানানো হয়। নিমতলী অগ্নিকান্ডের ঘটনার পর উচ্চ আদালত পুরান ঢাকা থেকে কেন কেমিক্যাল গুদাম সরানো হবে না তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়, রাষ্ট্র দীর্ঘ ১০ বছরেও এর জবাব দেয়নি।

১২ দাবিতে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের আন্দোলন

অগ্নিকান্ডে নিহত পরিবারগুলোর সংগঠন 'চুড়িহাট্টা অগ্নিকান্ডে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংস্থা' ১২টি দাবিতে এখনো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে এসব দাবি নিয়ে চুড়িহাট্টা মসজিদের সামনে মানববন্ধন করেন তারা। দাবিগুলো হলো- প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন করা, মূল অপরাধীকে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান, তদন্ত প্রতিবেদন মামলার চার্জশিট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রদান, আবাসিক এলাকা থেকে সকল প্রকার দাহ্য পদার্থ, অবৈধ নকল প্রসাধনী সামগ্রী কসমেটিকস তথা রাসায়নিক কেমিক্যালের গোডাউন, দোকান ও কারখানা উচ্ছেদ ও ট্রেড লাইসেন্স বাতিল, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রতিটি এলাকায় অভিযান পরিচালনা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের ফ্রিতে পড়াশনার সুযোগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আশ্বাস অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের চাকরি, দ্রুত কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পুরাতন ঢাকা থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নেয়া, ডিএসসিসি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিতাসের অবৈধ লাইন বন্ধ ও লিকেজ সংস্কার, ডিএসসিসির প্রতিটি এলাকায় অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এলপি গ্যাস ব্যবসায়ীদের মেয়াদোত্তীর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার ধ্বংস করা।

-

রানাপ্লাজার পরের অধ্যায়

টাঙ্গাইলের সাদ্দাম হোসেন (৩৪)। সাত বছর আগে নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড নামে একটি কোম্পানির বিক্রয় কর্মকর্তা ছিলেন। কর্মস্থল ছিল ঢাকার সাভারে ধসে পড়া ভবন রানা প্লাজার পাশে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল যখন ইতিহাসের ভয়াবহ ভবন ধসের ঘটনা ঘটে সে সময় অফিসে ছিলেন সাদ্দাম। পরবর্তী ঘটনা তার মনে নেই। ১০ দিন পর যখন জ্ঞান ফেরে তখন নিজেকে হাসপাতালে দেখতে পান। কেটে ফেলা হয়েছে ডান হাত। ভেঙেছে ডান পা, মাথায় ৩৬টি সেলাই, কানে ১০টি।

টানা একবছর কয়েকটি হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে কিছুটা স্বাভাবিক জীবনে ফেরেন সাদ্দাম। অসুস্থ অবস্থায় করেছেন মাস্টার্স পাস। কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে সাদ্দাম বেকার। অনেক চেষ্টার পরও একটি চাকরি জোটাতে পারেননি। এরইমধ্যে সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। ইনকাম বলতে সাদ্দামের আছে শুধু দুর্ঘটনার পর পাওয়া সঞ্চয়পত্র। যেখান থেকে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা পান। কিন্তু চড়া বাজারমুল্যের এসময়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার সাদ্দাম হোসেন। ১৩ নভেম্বর কথা হয় তার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'ওই ভয়াবহ স্মৃতির কথা মনে করতে চাই না। যদিও সেটা কোনোভাবেই পিছু ছাড়ে না। এখনো শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। ডান পা চলে না। নিয়মিত ঔষধ খেতে হয়। টাকা নাই, রোজগার নাই। বড় কঠিন দিন পার করতেছি।'

'এই রাষ্ট্রে আমাদের জন্মানোই পাপ'

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা ভয়াবহ ক্ষতি করে গেছে সাদ্দাম হোসেনের জীবনে। ইতিহাসের ভয়াবহতম এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ১ হাজার ১৩৪ জন। আহত উদ্ধার হন ২ হাজার ৪৩৮ জন। যাদের ৩৭ জন স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়েছেন। তাদেরই একজন সাদ্দাম হোসেন। আশা ছিল উচ্চশিক্ষিত হিসাবে অন্তত সরকারি একটি চাকরির ব্যবস্থা হবে। কিন্তু অনেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও ব্যবস্থা হয়নি। সারাজীবন পঙ্গু হয়ে যাওয়ার জন্য যে ক্ষতিপূরণের দাবি উঠেছিল সেটাও পাননি। পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ৫০ হাজার আর নির্দিষ্ট অঙ্কের পারিবারিক সঞ্চয়পত্র।

আক্ষেপ করে সাদ্দাম বলেন, এই রাষ্ট্রে আমাদের মতো মানুষদের জন্মানোই পাপ। হাসপাতালে থেকে পরীক্ষা দিয়ে মাস্টার্স পাস করলাম। তাতে লাভটা কী হলো? কতজনের কাছে ঘুরছি কেউ চাকরি দেয় নাই। সরকার অন্তত একটা ব্যবস্থা করতে পারত।

স্বাস্থ্য সংকট বাড়ছে আহতদের

রোদে যাওয়া যাবে না, উপুড় হওয়া যাবে না, একনাগাড়ে বেশিক্ষণ বসে থাকাও যাবে না, হাঁটতে হবে খুব ধীরে। ভয়াবহ রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে মেরুদণ্ড ভাঙা ফ্যান্টম টেক কারখানার

শ্রমিক জেসমিনের জন্য চিকিৎসকদের সর্বশেষ ব্যবস্থাপত্র এটি। কিন্তু এই ব্যবস্থাপত্র মানলে জীবন চলে না। তিনি বলেন, 'এক সপ্তাহ আগেও ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। ডাক্তারের সোজাকথা, যেসব নিয়মকানুন দিয়েছেন, তা মানতে হবে। কিন্তু দোকানে সারাদিন বসে থাকতে হয়। এখন ডাক্তারের কথা মাইন্যা চললে জীবন তো চলবে না।'

রানা প্লাজার দুর্ঘটনায় আহতদের অনেকেরই অবস্থা জেসমিনের মতো। আল্পনা, পারুল, নিলুফা, হালিমা, সাদ্দামসহ প্রত্যেকে ভয়াবহ স্বাস্থ্য জটিলতায় পড়েছেন। দিন যত যাচ্ছে, তত বেশি শরীর অবশ হয়ে আসছে। এসব রোগে যে কী চিকিৎসা প্রয়োজন তাও বুঝে উঠতে পারছে না অনেকে। রানাপ্লাজার আহত শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা যে দিন দিন খারাপ হচ্ছে তা উঠে এসেছে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ২০১৯ সালের এক জরিপে। সংস্থাটির প্রতিবেদন বলছে, আহত সাড়ে ২০ শতাংশ শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। তাঁরা মাথাব্যথা, হাত-পায়ে ব্যথা ও কোমরব্যথায় ভুগছেন। সাড়ে ২৮ শতাংশের অবস্থা ভালো। বাকি ৫১ শতাংশ শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। যদিও প্রায়ই তাঁরা নানা সমস্যায় ভোগেন। আবার সাড়ে ১০ শতাংশ শ্রমিক মানসিকভাবে সুস্থ নন। সাড়ে ৬৮ শতাংশের অবস্থা কমবেশি স্থিতিশীল। আর ২১ শতাংশ শ্রমিক মানসিক সমস্যা কাটিয়ে উঠেছেন।

দুর্ঘটনায় মাথা ও কোমরে বড় ধরনের আঘাত পেয়েছিলেন মাহমুদা আক্তার আলপনা। সে সময় সাত মাসের গর্ভবতীও ছিলেন। পেটের বাচ্চার তেমন ক্ষতি হয়নি। আলপনার শারীরিক অবস্থা এখন অনেক খারাপ। তিনি বলেন, সামান্য রইদে যাইতে পারি না। মাথা ঘোরে, কিনডিতে ব্যথা। হাল্কা ঠাণ্ডা লাগলে মাথা নিয়ে উঠতে পারি না। অবস্থা খুবই খারাপ। সপ্তাহে আমার তিনশো টাকার ঔষধ লাগে।

কিছুই মনে থাকে না পারুলের

রানাপ্লাজার পঞ্চম তলার ফ্যান্টম টেক লিমিটেড কারখানার সুইং অপারেটর ছিলেন পারুল আক্তার। ভবন ধসের সময় দৌড়ে বাঁচার চেষ্টা করেন। এরপর কী হয়েছে বলতে পারেন না। ছয় বছরেও সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি তিনি। মাথায় প্রচন্ড আঘাত পাওয়া পারুল জানান, এখনও হঠাৎ করে প্রচন্ড মাথা ব্যথা শুরু হয়। স্মৃতিশক্তিতে সমস্যা। কিছুই মনে থাকে না তার। মাথা এবং মেরুদণ্ডের ব্যথার জন্য দীর্ঘদিন ওষুধ খেয়েও অবস্থার উন্নতি হয়নি।

সর্বশেষ তার কিডনিতে পাথর ধরা পড়ে। পরে কিডনির অপারেশন করেন। প্রায় ছয় মাস আগে এই অপারেশনের পর থেকেই মাথাব্যথা আর শরীর দুর্বলতার কারণে আর কোনো কাজ করতে পারেন না পারুল। এখন ছুটে বেড়াচ্ছেন

দুর্ঘটনায় মাথা ও কোমরে বড় ধরনের আঘাত পেয়েছিলেন মাহমুদা আক্তার আলপনা। সে সময় সাত মাসের গর্ভবতীও ছিলেন। পেটের বাচ্চার তেমন ক্ষতি হয়নি। আলপনার শারীরিক অবস্থা এখন অনেক খারাপ। তিনি বলেন, সামান্য রইদে যাইতে পারি না। মাথা ঘোরে, কিনডিতে ব্যথা। হাল্কা ঠাণ্ডা লাগলে মাথা নিয়ে উঠতে পারি না। অবস্থা খুবই খারাপ। সপ্তাহে আমার তিনশো টাকার ঔষধ লাগে।

হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির (বিসিডব্লিউএস) নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার বলেন, রানাপ্লাজার দুর্ঘটনা আর দশটি দুর্ঘটনার মতো নয়। তাদের কাউন্সেলিং ঠিকঠাকভাবে হয়নি। এছাড়া হেলথ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টেও সঠিক চিত্র উঠে আসেনি। সেসময় তারা সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। ফলে অনেকেই অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছে।

সংসার ভেঙেছে অনেকের

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পর আহত শ্রমিকদের অধিকাংশের সংসার ভেঙ্গে গেছে। এরকম অনেকেই নারী। পঙ্গুত্ব, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, বেকারত্ব, দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার কারণে স্ত্রীকে ফেলে গেছেন স্বামীরা। এরকম একজন মানিকগঞ্জের নীলুফা বেগম। দুর্ঘটনায় ডান পা হারান। মেরুদণ্ডে আঘাত পাওয়ায় দেখা দিয়েছে কিডনির সমস্যা। অনুদান হিসাবে পেয়েছিলেন সাড়ে তিন লাখ টাকা। চিকিৎসা ও সংসার খরচেই তা শেষ হয়ে যায়। ২০১৬ সালে স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যান।

মাহমুদুল হাসান হৃদয় রানা প্লাজার (৮ম তলায়) নিউ ওয়েভ স্টাইল গার্মেন্টের কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর ছিলেন। ২০১৩ সালের ২১ এপ্রিল ভালোবেসে ঘর বেঁধেছিলেন ইয়াসমিন আক্তার ইতিকে। বিয়ের তিন দিন পরই ঘটে দুর্ঘটনা। পাঁজরের হাড় ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তারপর একটি পা অবশ হতে থাকে। ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলতে গেলেও আরেকজনের সাহায্য লাগে। এমন অবস্থা সইতে না পেরেই- স্ত্রী ফেলে চলে গেছেন। গর্ভের সন্তানও নষ্ট করেছেন।

রিতা খাতুন বলেন, 'আবারও মেরুদণ্ডে ব্যথা হচ্ছে। তলপেটে ইনফেকশন হয়ে গেছে। সাভারের সুপার ক্লিনিকে ১৫ দিন ধরে চিকিৎসা নিচ্ছি। ইতোমধ্যে ৮ থেকে ৯ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু এখন আর কেউ খোঁজ নেয় না। স্বামী আতিয়ার রহমানও দীর্ঘদিন হলো ফেলে গেছেন। সংসার বলতে কিছুই নেই।

বেকারত্বে হাঁসফাঁস শ্রমিকদের

রানাপ্লাজায় যারা আহত হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই বেকার জীবন পার করছেন। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাদের চাকরিতে নেওয়া হয় না। কেউ কেউ চাকরি পেলে উৎপাদনের টার্গেট পূরণ করতে না পারায় বাদ দেওয়া হয়। রানা প্লাজার কথা শুনলে কারখানার গেট থেকে বের করে দেওয়া হয়। নাজমা বেগম নামে একজন শ্রমিক বলেন, 'ছোট বেলা থেইক্যা অনেক কষ্ট কইর‍্যা বড় হইছি। পরিবারকে চালাইছি। অহন আমিই বেকার। ক্যামনে জীবন চলবে এই চিন্তা করলে দুনিয়া ভাইঙ্গা আসে। অনেক কারখানার গেটে ঘুইর‍্যা একটা চাকরি পাইছিলাম। হ্যারা বাদ দিয়া দিছে। কারণ মাথা ঘোরে, টার্গেট পূরণ কইর‍্যা দিতে পারি না। কয় রানাপ্লাজার লোক অনেক ট্যাকা পাইছি। কিন্তু আমি শুধু ৫০ হাজার টাকা ছাড়া কিছুই পাই নাই।'

রানাপ্লাজার আহত শ্রমিকদের বেকারত্বের চিত্র উঠে এসেছে অ্যাকশন এইডের রিপোর্টেও। তাদের প্রতিবেদন বলছে, আহত পোশাক শ্রমিকের ৫১ শতাংশ বর্তমানে বেকার। তাঁদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ শারীরিক ও ২৭ শতাংশ মানসিক দুর্বলতার কারণে কাজ করতে পারছেন না। তবে আহত শ্রমিকদের ৪৯ শতাংশ পোশাক কারখানায়, টেইলারিং, দিনমজুরি, কৃষিসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসাও করেন। অবশ্য দুই বছর আগেও আহত শ্রমিকদের ৪৮ শতাংশ বেকার ছিলেন।

আহত শ্রমিকদের মধ্যে ১৫ দশমিক ৫০ শতাংশ পুনরায় পোশাক কারখানার কাজে ফিরে গেছেন। তবে ২ শতাংশ শ্রমিক দিনমজুরি করছেন। আড়াই শতাংশ শ্রমিক বাসাবাড়ির কাজ করছেন। এ ছাড়া অনেকে টেইলারিং, কৃষি ও বিক্রয়কর্মীর কাজ করছেন। জরিপের তথ্যানুযায়ী অধিকাংশ শ্রমিক পরিবারের মাসিক আয় ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা। ২১ শতাংশ শ্রমিক পরিবারের আয় ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা। অবশ্য ২০ শতাংশ শ্রমিক পরিবারের আয় ৫ হাজার টাকার নিচেই রয়ে গেছে। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, আহত শ্রমিকরা মানসিক ও শারীরিক সংকট নিয়েই বেঁচে আছে। বেশিরভাগই শারীরিক ক্ষত নিয়েই দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করছেন। কেননা তাঁদের জন্য পুরো সময় কাজ করা কঠিন। তাঁরা যে অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছিল, তা অতিদ্রুত শেষ হয়ে গেছে।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, আহত শ্রমিকরা মানসিক ও শারীরিক সংকট নিয়েই বেঁচে আছে। বেশিরভাগই শারীরিক ক্ষত নিয়েই দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করছেন। কেননা তাঁদের জন্য পুরো সময় কাজ করা কঠিন।

ঘুরেও দাঁড়িয়েছেন অনেকে

রানাপ্লাজার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রিতা, রেখা, হালিমা, ফাতেমা ও জাকিয়াদের শারীরিক শক্তি কেড়ে নিয়েছে। সেই সঙ্গে বদলে দিয়েছে পেশা। রিতা এখন টেইলার্সের দোকানের মালিক, রেখা সেই দোকানের কর্মচারী। হালিমা ও জাকিয়া মুদি দোকানদার। আর ফাতেমা গার্মেন্টস ছেড়ে এখন বাঁশ ও বাঁশের চাটাই বিক্রি করে স্বাবলম্বী। তারা প্রত্যেকেই প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা কাজে লাগিয়েছেন। শারীরিক ও মানসিক বাধা জয় করে সচল রেখেছেন নিজেদের সাংসারিক জীবনের চাকা।

শুধু তারাই নন। আশার আলো, হাসিখুশি, প্রত্যাশা ও লাল গোলাপসহ বিভিন্ন সেলফ হেল্প গ্রুপের তথ্য অনুযায়ী, রানাপ্লাজার দুর্ঘটনায় আহত প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিক অন্য পন্থায় স্বাবলম্বী হয়েছেন। কেউ কেউ আবার সহায়তার পুরো টাকাই সাংসারিক ব্যয় ও চিকিৎসা খাতে খরচ করে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। রিতা বলেন, আমি তো ক্ষতিপূরণ পাইনি। যা পেয়েছি তা অনুদান। অ্যাকাউন্ট করে ৫৫ হাজার টাকা দিয়েছে। আর বিকাশের মাধ্যমে তিন দফায় ১৫ হাজার করে ৪৫ হাজার টাকা পেয়েছি। বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন ব্যক্তিপর্যায় থেকে ৩০ হাজার টাকা পেয়েছি। ওষুধ না কিনে ওই টাকা জড়ো করে ২০১৩ সালের শেষের দিকে দেড় লাখ টাকা খরচ করে মেয়ের নামে টেইলার্সের দোকান দিয়েছি। এখন আমার ঘরে তিনটি মেশিন। একজন কর্মচারীও আছে। নানা বাধা সত্ত্বেও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। মাসে ২০-২৫ হাজার টাকা আয় হয়।

ক্ষতিপূরণ নয় অনুদান পেয়েছি

জানা যায়, রানাপ্লাজার পাঁচটি পোশাক কারখানায় পাঁচ হাজারের মতো শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। নিহতদের মধ্যে ২৯১টি লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়। দুর্ঘটনার পর ২০১৪ সালে বিদেশি ক্রেতা ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন হতাহতদের পরিবারকে সহায়তা দিতে ৪ কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠনের ঘোষণা দেয়। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকেও আলাদাভাবে শ্রমিকদের সহযোগিতা করা হয়। বিজিএমইএ জানিয়েছে, রানাপ্লাজা ধসের পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিজিএমইএ ১৫ কোটি, প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ২৫ কোটি এবং দাতাদের কাছ থেকে ৪০ কোটি টাকা পাওয়া যায়।

হাইকোর্টের এক নির্দেশে রানাপ্লাজায় নিহত, নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজন এবং আহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে সরকারি উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক নিহত, নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবার এবং স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়া শ্রমিক ১৪ লাখ ৫১ হাজার ৩০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। আর আহত হওয়ার ধরন অনুযায়ী, শ্রমিকদের পাওয়ার কথা দেড় লাখ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সাড়ে সাত লাখ টাকা। কিন্তু ওই টাকা দিতে রাজি হননি পোশাক শিল্পের মালিকরা।

শ্রমিক নেতারা জানান, সরকারি কমিটি নিহত শ্রমিকদের জন্য ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে দুঃখ-যন্ত্রণা বাবদ পাঁচ লাখ টাকা ধরা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-র বিধানে দুঃখ-যন্ত্রণা বাবদ ক্ষতিপূরণের কোনো উল্লেখ না থাকায় পরে তা বাদ দেওয়া হয়। কমিটির সুপারিশে আহত শ্রমিকদের আঘাতের ধরন ও ক্ষতির প্রকৃতি অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে স্থায়ীভাবে পঙ্গু শ্রমিকদের জন্য ১৪ লাখ ৫১ হাজার ৩০০ টাকা ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করা হয়েছে। স্পাইনাল কর্ডে আঘাত পাওয়া, দুই বা ততোধিক অঙ্গহানি হওয়া শ্রমিকেরাও এই ভাগে পড়বেন এবং একই হারে ক্ষতিপূরণ পাবেন। দ্বিতীয় ভাগে এক হাত বা এক পা হারানো শ্রমিকদের সাড়ে সাত লাখ টাকা এবং তৃতীয় ভাগে দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন শ্রমিকদের সাড়ে চার লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের সুপারিশ করা হয়। চতুর্থ ভাগে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের দেড় লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

একই সঙ্গে রানাপ্লাজার সব আহত ও অসুস্থ ব্যক্তিদের পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিনা খরচে সার্বিক চিকিৎসা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। যাঁদের অঙ্গহানি হয়েছে, তাঁদের একটি স্থায়ী কার্ড দেয়ার কথা বলা হয়, যাতে তাঁরা আজীবন তাঁদের কৃত্রিম অঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় করাতে পারেন। কিন্তু এসবেরই কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশ

> দুর্ঘটনার পর আহত, নিহতের পরিবার যে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন তাকে ক্ষতিপূরণ বলতে রাজী নন কেউই। তারা বলেন, আমাদের সঙ্গে বিজিএমইএ, সরকার মহাপ্রতারণা করেছে।

সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির (বিসিডব্লিউএস) নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার বলেন, ক্ষতিপূরণের টাকা হিসাবের পদ্ধতি আছে। একজন মানুষ সুস্থ থাকলে তার বাকি জীবনে কত টাকা আয় করতেন সেভাবে ক্ষতিপূরণের টাকা হিসাব করতে হয়। সেই হিসাবে একজন যিনি পুরো পঙ্গু হয়ে যাবেন বা কাজ করার ক্ষমতা হারাবেন, আমরা হিসাব করে দেখিয়েছিলাম তা ৪৫ লাখ টাকার মতো। কিন্তু সরকারি কমিটির সুপারিশও মানেনি বিজিএমইএ। ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইচ্ছেমতো কিছু থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ঠিকমতো চিকিৎসা দেয়া হয়নি। অনেকেই এখনো কাজ পাননি। অনেকে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছেন। তাঁদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি।

দুর্ঘটনার পর আহত, নিহতের পরিবার যে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন তাকে ক্ষতিপূরণ বলতে রাজী নন কেউই। তারা বলেন, আমাদের সঙ্গে বিজিএমইএ, সরকার মহাপ্রতারণা করেছে। সাদ্দাম হোসেন বলেন, আমার সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে গেলো আর আমি টাকা পেলাম মাত্র ৫০ হাজার। এটাকে কীভাবে ক্ষতিপূরণ বলে? তার মতে, দুর্ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রায় ১২৭ কোটি টাকা অনুদান দেয়। সে টাকা এখনো পড়ে আছে। অথচ আহতরা ভয়াবহ অভাবের মধ্যদিয়ে দিন পার করছে।

ক্ষতিপূরণ প্রদানে শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী কর্মস্থলে কর্মরত অবস্থায় কেউ নিহত বা আহত হলে ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। শ্রম আইনের ১৫০ ধারা অনুযায়ী এ ক্ষতিপূরণ দেবে মালিকপক্ষ। নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লাখ ও আহত ব্যক্তিকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয়া বাধ্যতামূলক। তবে অধিকাংশ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ এরকম ক্ষতিপূরণ দেয় না। আবার আইনে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে সেটিও অপর্যাপ্ত বলেছেন আইনজ্ঞ ও খাত সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ লেবার কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট একেএম নাসিম বলেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, তাজরিন, রানাপ্লাজাসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মালিকরা আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন না। দুর্ঘটনার পর তারা বলে আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। আহত নিহত শ্রমিকরা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কিংবা সরকারের কাছ থেকে অনুদান পান। যা শ্রম আইনের ক্ষতিপূরণের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু আইন অনুযায়ী এটাকে ক্ষতিপূরণ বলা যায় না। ক্ষতিপূরণ একমাত্র মালিককেই দিতে হবে। আমাদের আইনে যে ক্ষতিপূরণের বিধান আছে তা অপর্যাপ্ত। একজন মানুষ মারা গেলে কিংবা পঙ্গু হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ ২ লাখ বা আড়াই লাখ টাকায় শোধ করা যায় না। এরপরও এই টাকাই মালিকরা দিচ্ছে না। তাহলে এ বিষয়ে সরকারকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের আহ্বায়ক ড. হামিদা হোসেন বলেন, এখন যে আইন আছে সেটি অনেক পুরনো। এ আইন দিয়ে শ্রমিকের আর্থিক সুরক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। একজন মানুষ মারা গেলে তার জীবনের মূল্য মাত্র ২ লাখ টাকায় হয় না। এজন্য রানাপ্লাজার দুর্ঘটনার পর আইএলও এবং সরকারি কমিটি মিলে শ্রমিকদের ক্ষতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার তালিকা করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটি বাস্তবায়ন হয়নি।

থমকে আছে মামলা

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার ক্রিমিনাল আইনে তিনটি মামলা হয়। শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারায় আরও ১১টি মামলা হয়। এরইমধ্যে সাত বছর পেরিয়ে গেলেও মামলাগুলোর বিচার কাজ মোটেও এগোয়নি। অবহেলাজনিত মৃত্যু চিহ্নিত করে একটি হত্যা মামলা করে পুলিশ। ইমারত নির্মাণ আইন লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণের অভিযোগে অপর মামলাটি করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। আর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ভবন নির্মাণসংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে আরেকটি মামলা করে।

ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালত সূত্র জানিয়েছে, মামলার দুজন অভিযোগপত্রভুক্ত আসামির পক্ষে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় বর্তমানে মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ বন্ধ রয়েছে। কবে নাগাদ মামলাটির সাক্ষ্য গ্রহণ কার্যক্রম শুরু হবে, এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানাতে পারেননি ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রধান আইন কর্মকর্তা সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) খোন্দকার আবদুল মান্নান। তিনি বলেন, রানাপ্লাজা ধসের ঘটনার হত্যা মামলায় দুজন আসামির পক্ষে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ বহাল থাকার কারণে সাক্ষ্য গ্রহণ বন্ধ রয়েছে। আমরা আশা করছি, চলতি বছরের মধ্যে ওই দুই আসামির পক্ষে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হবে এবং মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ কার্যক্রম শুরু হবে। তিনি বলেন, উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের ব্যাপারে তাঁদের (পিপি) পক্ষে কিছু করার থাকে না।

আদালতের সূত্র জানিয়েছে, প্রায় চার বছর আগে ২০১৬ সালের ১৮ জুলাই হত্যার অভিযোগে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালত অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। বিচারিক

আদালতের অভিযোগ গঠনের আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আট আসামি হাইকোর্টে আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে এই আটজনের পক্ষে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ আসে। ইতিমধ্যে ছয় আসামির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। কেবল সাভার পৌরসভার তৎকালীন মেয়র রেফায়েত উল্লাহ এবং তৎকালীন কাউন্সিলর মোহাম্মদ আলী খানের পক্ষে স্থগিতাদেশ বহাল আছে।

রানাপ্লাজা ধসের জন্য ছয়জন সরকারি কর্মকর্তাকে অভিযোগপত্রভুক্ত আসামি করার অনুমতি না পাওয়ার কারণে তিন বছর ঝুলে ছিল এই মামলা। সে সময় জনপ্রশাসন ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুক্তি ছিল, যাঁরা বড় অপরাধ করেননি, তাঁদের অভিযোগপত্রভুক্ত আসামি করার অনুমতি দিতে পারবে না তারা। শেষ পর্যন্ত সরকারের অনুমোদন না পাওয়া গেলেও তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। আদালত সূত্র বলছে, রানাপ্লাজা ধস হত্যা মামলায় ৪১ আসামির মধ্যে বর্তমানে কারাগারে আছেন একজন। তিনি হলেন রানাপ্লাজা ভবনের মালিক সোহেল রানা। জামিনে আছেন ৩১ আসামি। পলাতক ছয়জন। মারা গেছেন ৩ জন।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসের ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) আইন শাখার উপ পরিচালক বরকত আলী বলেন, বাংলাদেশে বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা রানাপ্লাজা মামলায় বড় প্রভাব ফেলেছে। অথচ এ মামলা আর দশটি মামলার মত না। এ মামলাকে গুরত্বের সঙ্গে দেখা উচিৎ ছিল।

নিরাপদ হয়নি কারখানার পরিবেশ

জানা যায়, রানাপ্লাজা ধসের পর শ্রমিকদের সুরক্ষায় পশ্চিমা দেশগুলোর পোশাক ক্রেতারা নিজেদের অর্থায়নে দুটি সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের বিনিয়োগের শর্ত জুড়ে দেয়। ইউরোপীয় ক্রেতাদের দ্য অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ এবং উত্তর অ্যামেরিকার ক্রেতাদের দ্য অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি সংগঠন দুটি বাংলাদেশে কারখানাগুলোর নিরাপত্তা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং সন্তুষ্ট হতে না পারলে তারা দেশটির সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। অ্যাকর্ডের অধীনে ১৬৪৫ টি কারখানা রয়েছে। তারা প্রাথমিকভাবে যত ত্রুটি চিহ্নিত করেছিল জানুয়ারি পর্যন্ত তার ৯১ ভাগই সংস্কার হয়েছে। ২৭৩টি কারখানা শতভাগ সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। অন্যদিকে অ্যাকর্ডের অধীনে থাকা কারখানাগুলো ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৯৩ ভাগ সংস্কার কাজ শেষ করেছিল। ঐ সময় পর্যন্ত ৪২৮টি কারখানা শতভাগ ত্রুটিমুক্ত হয়েছে। তাদের অধীনে মোট কারখানা ছিল ৭১৪টি।

পোশাক শ্রমিক নেতা ও সংশ্লিষ্টদের মতে, কারখানার পরিবেশ খানিকটা নিরাপদ হলেও পোশাক শ্রমিকদের অবস্থার তেমন

জাতীয় পেনশন স্কিম, সামাজিক বীমা, স্বল্প মূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে শ্রমজীবীর জীবন-মান উন্নয়নে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

- সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

কোনো উন্নতি হয়নি। বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ বাংলাদেশে নিয়মিত ঘটনা। এমনকি দেশে করোনা সংকটের মধ্যে তৈরি পোশাকশিল্প খাতে সরকারের নানা প্রণোদনা ঘোষণার পরও বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হচ্ছে। করোনার বিস্তার রোধে জনসমাগম এড়াতে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে গণপরিবহন বন্ধ করে দেওয়া হলেও পোশাক শ্রমিকদের ব্যাপারে সরকার বা মালিকপক্ষ শুরুতে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের (এনজিডব্লিউএফ) সভাপতি আমিরুল হক আমিন বলেন, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও শ্রমিক নিরাপত্তা আজকের দুনিয়ায় একটি ইস্যু। অথচ আমাদের মালিকরা এটা কখনোই মানেন না। করোনাভাইরাসের সময়েও তারা অসংখ্য শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। স্বাস্থ্যবিধি ঠিকঠাক মানেনি।

রানা প্লাজার সেই জমি এখন পরিত্যক্ত ডোবা

সরেজমিনে দেখা যায়, রানাপ্লাজার সেই পরিত্যক্ত জমির পাশে রয়েছে কয়েকটি দোকান। এসব দোকানে রেন্ট-এ-কারের ব্যবসা চলে। এ ছাড়া ছোটখাটো পান-বিড়ির দোকানও আছে। আর সামনে ডোবায় চলে কৈ মাছ চাষ। রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর নীতিনির্ধারকদের অনেকের ঘোষণা ছিল, এই জমি দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের কল্যাণে কাজে লাগানো হবে। কিন্তু সেই আশ্বাস এখনও আলোর মুখ দেখেনি।

-

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শ্রমখাতের গতিশীলতা: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

[বাংলাদেশে শ্রমখাতের পরিসর ক্রমাগত বাড়লেও এই খাতের প্রবণতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা-বিতর্ক অতি সামান্য। সেই শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে এ বছর থেকে এই প্রকাশনায় নিয়মিত শ্রমখাতের গতিশীলতার ধরন সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রকাশিত হতে থাকবে। এ বছর প্রাথমিকভাবে আমরা কয়েকটি সূচকে এই গতিশীলতার অভিমুখ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। সম্পাদক]

বাজেট বিশ্লেষণ: আর্থিক বরাদ্দে শ্রমখাতের প্রতি গুরুত্বের ঘাটতি

বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতির মূল দলিল বাৎসরিক জাতীয় বাজেট। আর শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট দুটি মুখ্য মন্ত্রণালয় হলো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। গত কয়েকটি বছরের জাতীয় বাজেটে এই তিন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দচিত্র ছিল নিম্নরূপ (তথ্যসূত্র: বিভিন্ন বছরে দেয়া অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা):

সারণী-১৩: জাতীয় বাজেটে শ্রমখাতে বরাদ্দ

বছর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ (হিসাব: কোটি টাকায়)	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ (হিসাব: কোটি টাকায়)	সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের জন্য সম্মিলিত বরাদ্দ (হিসাব: কোটি টাকায়)
২০১৭-১৮	২৬৮	৬৮৮	৪০০২৬৬
২০১৮-১৯	২২৭	৫৯৫	৪৬৪৫৭৩
২০১৯-২০	৩১৩	৫৯১	৫২৩১৯০
২০২০-২১	৩৫০	৬৪২	৫৬৮০০০

উপরের বরাদ্দচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, চার বছরের ব্যবধানে:

[ক] শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ৩১ শতাংশ। আর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান

মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ কমেছে প্রায় ৭ শতাংশ। একই সময়ে জাতীয় সম্মিলিত বরাদ্দের মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থানের হিস্যা ২০১৭-১৮ এর দশমিক শূন্য ছয় শতাংশই চার বছর পরও একই অংকে বহাল আছে, বাড়েনি। অন্যদিকে প্রবাসী কল্যাণের বরাদ্দ হিস্যা চারবছর আগের দশমিক ১৭ শতাংশ থেকে সর্বশেষ বাজেটে দাঁড়িয়েছে দশমিক ১১ শতাংশে। অর্থাৎ কমে গেছে।

দুটি মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত বাজেট প্রবণতা থেকে এটা অনুমান করা যায়, জাতীয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে শ্রমখাত খুব সামান্যই মনযোগ পাচ্ছে। বছরওয়ারী জাতীয় বরাদ্দের হিস্যায় শ্রমজীবীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অংশীদারিত্ব বাড়েনি। যদিও অর্থের অংকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ চার বছরের ব্যবধানে কিছুটা বেড়েছে।

মজুরি বৈষম্য এবং সম্পদ বৈষম্য

স্বাধীনতার পর গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে প্রায় তিন শ' গুণ। দারিদ্র্য অনেক কমেছে। প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ধারাও মহামারির পূর্বপর্যন্ত বহাল ছিল সুখকর মাত্রায়। কিন্তু এই প্রবৃদ্ধির সুবিধা সমাজের নীচুতলার মানুষদের অর্থনীতিতে খুব বেশি প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'সমাজে আয়বৈষম্য ক্রমাগত অব্যাহত।'

মজুরি বৈষম্য: সরকারি খাত ও পোশাক শিল্পখাতের একটা তুলনা

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় শিল্পখাত পোশাক তৈরি কারখানায় শ্রমিকদের সপ্তম গ্রেডের একজন শ্রমিকের 'সর্বমোট মজুরি ২০১৮ সালে ধরা হয়েছে ৮ হাজার টাকা; যাতে মূল মজুরি হলো ৪ হাজার ১০০ টাকা। ২০১৩ সালে এটা ছিল ৩ হাজার টাকা। সেসময় মোট বেতন ছিল ৫ হাজার ৩০০ টাকা। অর্থাৎ ৫ বছর পর মূল মজুরি বেড়েছে ১১০০ টাকা। তারও আগে পোশাক খাতে মোট মজুরি ছিল তিন হাজার টাকা। অর্থাৎ ২০১০ থেকে ২০২০ এই দশ বছরে সাধারণ হিসাবে পোশাক শ্রমিকদের নিম্নতম গ্রেডে মজুরি বেড়েছে স্কেলের হিসাবে তিন হাজার থেকে আট হাজার টাকা। বৃদ্ধির এই হার প্রায় ১৬৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, সরকারি কর্মচারিদের বেতন ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বেড়েছে প্রায় ২২১ শতাংশ (প্রথম আলো, ২৫ জুন ২০২০)। আপতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির ধারা খারাপ নয়। কিন্তু কার্যত শ্রমিকদের বেতন বাড়ছে তিন হাজার থেকে আট হাজারে। অর্থাৎ শ্রমিকরা কম মজুরির চক্রেই আটকে থাকছে। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারিদের উলম্ফন ঘটছে উচ্চবেতনের চক্রে। ২০১৫ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ২০ গ্রেডের নতুন

যে মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয় তাতে সর্বনিম্ন গ্রেডে মূল বেতনই ছিল আট হাজার ২৫০ টাকা। আর সেসসময় নিম্নতম গ্রেডের একজন পোশাক শ্রমিকের মূল বেতন ছিল ৩ হাজার টাকা। তার মানে একই সময়ে সরকারি কর্মচারিদের নিম্নতম অবস্থানের কর্মী নিম্নতম গ্রেডের একজন পোশাক শ্রমিকের মজুরির চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি মজুরি পেতেন। পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির ধাপগুলোতে এই ব্যবধান অবশ্যই আরো বেড়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বর্তমানের বেতন কাঠামোতে মূল মজুরি ৮৬ হাজার পর্যন্ত রয়েছে (মুখ্যসচিব)। এছাড়াও সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিরা বহু ধরনের ভাতাও পান। দেশের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সংসদ সদস্যরা বহু ধরনের সুযোগ সুবিধার মাঝে কেবল মাসিক বেতনই পান ৫৫ হাজার টাকা। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্যণীয় যে, শ্রমিকদের সঙ্গে সমাজের অন্যদের মজুরি পার্থক্য বিপুল। শ্রমজীবীদের মজুরিগত প্রান্তিকীকরণ বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে বলা যায়। অথচ তারাই অর্থনীতির মূলশক্তি।

সম্পদ বৈষম্য

মজুরি বৈষম্যের মতোই শ্রমিকরা চরমভাবে সম্পদ বৈষম্যেরও শিকার। ২০১৯-২০ এর হিসাবে বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় আয় দাঁড়িয়েছে ২০৬৪ ডলার। টাকার অংকে এটা এক লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা। কিন্তু এই হিসাব শ্রমিকদের জন্য চরম অর্থহীন। বরং আয় বঞ্চনা তাদের সম্পদ বঞ্চনায়ও ফেলেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে গরীব এমন বাংলাদেশীদের ৫ শতাংশের সম্পদ ২০১০ সালে ছিল দেশের মোট সম্পদের দশমিক ৭৮ শতাংশ। ২০১৬ সালে সেটা আরো কমে হয়েছে দশমিক ২৩ শতাংশ। অন্যদিকে একই সময়ে সবচেয়ে ধনী বাংলাদেশীদের সম্পদের পরিমাণ ২৪ দশমিক ৬১ শতাংশ থেকে ২০১৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৮২ শতাংশ। বলা বাহুল্য পরবর্তী বছরগুলোতে এই ব্যবধান আরও বেড়েছে।

মজুরি 'বৃদ্ধি'র ধারা দারিদ্র্য নির্মূল কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়

এক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের রফতানিমুখী দুটি শিল্পখাতের উদাহরণ তুলে ধরে পরিস্থিতির অভিমুখ বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় শিল্পখাত পোশাক তৈরি কারখানায় শ্রমিকদের সর্বশেষ মজুরি বেড়েছে ২০১৮ সালে। এতে সপ্তম গ্রেডের একজন শ্রমিকের 'সর্বমোট মজুরি' ধরা হয়েছে ৮ হাজার টাকা; যাতে মূল মজুরি হলো ৪ হাজার ১০০ টাকা। ২০১৩ সালে এটা ছিল ৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৫ বছর পর মূল মজুরি বেড়েছে ১ হাজার ১০০ টাকা। এই পাঁচ বছরে দেশে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে গড়ে ৫-৬ শতাংশ হারে। সে হিসাবে পোশাক খাতের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কতটা বাড়ছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

সারণী-১৪: পোশাক খাতে মজুরি বৃদ্ধি চিত্র

বছর	মাসিক মোট মজুরি	মাসিক মূল মজুরি
২০১৮	৮,০০০	৪১,০০
২০১৩	৫,৩০০	৩,০০০
২০১০	৩,০০০	২,০০০

অন্যদিকে, চা খাতেও ২০১৮ সালে এক দফা নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয়েছিল। সেসময় এক জন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ২০১৫ সালে নির্ধারিত দৈনিক ৮৫ টাকা থেকে বেড়ে ১০২ টাকা হয়েছে (২০ থেকে ২৩ কেজি পাতা তোলা সাপেক্ষে!)। ত্রিশ দিনের হিসাবে মজুরি বেড়েছে ৫১০ টাকা। অর্থাৎ তিন বছর পর এক জন শ্রমিকের মজুরি ৫১০ টাকা বেড়ে দাঁড়ালো ৩ হাজার ৬০ টাকা। **চা খাতে মজুরি বৃদ্ধির চিত্রটি এরকম:**

বছর	দৈনিক মজুরি	মাসিক মজুরি
২০১৮	১০২	৩০৬০
২০১৫	৮৫	২৫৫০
২০১৩	৬৯	২০৭০

উল্লেখ্য, সিলেট সীমান্তের অপর পাড়ে আসামে চা খাতে মজুরি বরাক ভ্যালিতে ১৪৫ রূপি এবং আসাম ভ্যালিতে ১৬৭ রূপি। অন্যদিকে, দক্ষিণ এশিয়ার আরেক চা উৎপাদক দেশ শ্রীলংকায় মজুরি দৈনিক ৫ দশমিক ৫ ডলার। সর্বশেষ ২০২০ সালে এই খাতে বাংলাদেশে মজুরি দৈনিক ১৮ টাকা বাড়িয়ে ১২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে (মাসে ৩৬০০ টাকা)।

জাতীয় অর্থনীতিতে শ্রমজীবীদের অবদান বাড়ছে

বাংলাদেশের বাজেট বরাদ্দে শ্রমজীবীরা কী পাচ্ছেন সেটা উপরে দেখেছি আমরা। সেই প্রাপ্তি মন্ত্রণালয়ের হিসাবে অতি সামান্য এবং তুলনামূলকভাবে একেবারে প্রান্তিক। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানে শ্রমজীবীরাই সবচেয়ে এগিয়ে। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান দুই উৎসই হলো প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ এবং তৈরি পোশাক রফতানি থেকে পাওয়া আয়। জিডিপিতে এই দুই খাতের অবদান সম্মিলিতভাবে প্রায় ২৫ ভাগ। প্রবাসে প্রায় সোয়া কোটি বাংলাদেশী কাজ করছেন এখন। আর পোশাক খাতে কাজ করছে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক। অর্থাৎ প্রবাসী ও পোশাক শ্রমিক মিলে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে প্রায় এক কোটি ৬৫ লাখ শ্রমিক। মহামারির পূর্বপর্যন্ত উভয় খাত বছর বছর কেবল প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বৈশ্বিকভাবে প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশ প্রথম সারির পাঁচটি দেশের মধ্যে রয়েছে। আর পোশাক খাতের আয়েও বাংলাদেশ প্রথম ২-৩টি দেশের মধ্যে রয়েছে। রফতানি আয়ে পোশাক খাতের হিস্যা ৮০ ভাগ। বন্দর কর্তৃপক্ষের আয়ের ৪০ ভাগই পোশাক পণ্যসংশ্লিষ্ট। প্রায় ৪ হাজার কোটি ডলার রফতানি আয় এই খাত থেকে। আর প্রবাসীরা দেশে পাঠান প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এই দুই খাত মিলে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। যা সরাসরি শ্রমজীবীদের অবদানে বাংলাদেশ অর্জন করছে।

কর্মস্থলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির বড় ধরনের উন্নতি নেই: তিন বছরের বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে শ্রমিক জীবনে সংকটের একটা বড় জায়গা হলো পেশাগত স্বাস্থ্যজনিত সংকট এবং নিরাপত্তাহীনতা। বিশেষ করে কর্মস্থলে এবং সেখানে আসা-যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার উদাহরণ এখানে বিপুল। শোভন কাজের পরিবেশ বাংলাদেশে শ্রমিকদের জন্য প্রকৃতই অধরা। রানাপ্লাজার মতো

ঘটনা তার সাক্ষী হয়ে আছে। সেইফটি এন্ড রাইটস প্রতিবছর সংবাদপত্রভিত্তিক যে হিসাব প্রকাশ করে তাতে গত কয়েক বছরে **কর্মসংস্থলে শ্রমজীবীদের মৃত্যুর নিম্নরূপ চিত্র** পাওয়া যায়:

বছর	শ্রমজীবীদের মৃত্যু
২০১৪	৩২০
২০১৫	৩৭৩
২০১৬	৩৮২
২০১৭	৪৩৭
২০১৮	৫৯৩
২০১৯	৫৭২
২০২০	৪৩২

উপরের চিত্র থেকে কর্মস্থলে বা কর্মস্থলে যাওয়ার পথে শ্রমিকদের মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার চিত্রই দেখা যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এরকম দুর্ঘটনায় খাত হিসেবে এগিয়ে থাকতে দেখা গেছে পরিবহন ও নির্মাণ সেক্টরকে।

সমাবেশের স্বাধীনতা: করুণ পরিস্থিতি

শ্রমজীবীদের অধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক সমাবেত হওয়া এবং সংঘ গঠনের স্বাধীনতা। কিন্তু এই স্বাধীনতায় বাংলাদেশের শ্রমখাতের অর্জন বা প্রাপ্তি সামান্য। কারখানা পর্যায়ে ২০ ভাগ শ্রমিকের সম্মতিতে এখানে ইউনিয়ন গঠনের আইনী সুযোগ থাকলেও তার বাস্তব চর্চাকে দুরূহ করে রাখা আছে। প্রথম সারির শিল্পখাতসমূহের মধ্যে চা ও চামড়া খাতে শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মজুরিসহ অন্যান্য বিষয়ে দরকষাকষি করতে পারলেও প্রধান শিল্পখাত তৈরি পোশাক সেক্টরে কেন্দ্রীয়ভাবে সেরকম কোন সুযোগ নেই। এমনকি খুবই নগণ্য সংখ্যক কারখানাতে কার্যকর ইউনিয়ন রয়েছে। শ্রমিক সংগঠকরা এই খাতে সংগঠিত শ্রমিক সংখ্যা এক শতাংশ বলে প্রচার করে থাকেন। পোশাক তৈরি কারখানার মালিকরা এই সংখ্যা ১০ শতাংশ বলে দাবি করেন। তবে প্রচারমাধ্যমের নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদনগুলো বলে থাকে, চার-পাঁচ হাজার গার্মেন্ট কারখানায় কাগজেপত্রে ইউনিয়ন রয়েছে ৫-৬ শ' কারখানায়। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই এই খাত অনেকাংশে সংঘ গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। একই সঙ্গে এই বাস্তবতা আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর (সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সিবিএ) এর সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশ এসব সনদের স্বাক্ষরকারী দেশ। অথচ শ্রমিক সংগঠকদের ভাষ্য অনুযায়ী ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নিলেই সেই শ্রমিকের

চাকুরিচ্যুতি ঘটে। এমনকি তাদের এলাকা ছাড়াও করা হয়। অথচ আমাদের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন কারখানা পর্যায়ে থাকলে শিল্প বিরোধের অনেকগুলোই দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যায়। কথায় কথায় পুলিশ ডাকতে হয় না। কিন্তু সেই পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে না।

২০০৬-এর শ্রম আইনে মালিক ও শ্রমিকদের সমন্বয়ে কারখানা পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক একটা কমিটি গঠনের বিধান আছে। এই বিধানকে পোশাক খাতে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করার একটা প্রবণতা রয়েছে ইদানিং। যাকে শ্রমিকরা প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল ইউনিয়ন বলে মনে করছে না। তাঁদের বিবেচনায় চিরায়ত ধারার ট্রেড ইউনিয়ন না থাকায় শ্রম আইনে যৌথ দরকষাকষির যে বিধান রয়েছে তারও সঠিক পদ্ধতি মাফিক কোন চর্চা হচ্ছে না।

বিরাষ্ট্রীয়করণে গতি

২০২০ সালে দেশে নতুন করে রাষ্ট্রীয় শিল্পখাতে বিরাষ্ট্রীয়করণের ঢেউ উঠেছে। পাটখাতে একযোগে ২৫টি কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর চিনিকলগুলোও বন্ধ করা হবে বলে শঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে। মূলত লোকসানের কথা বলেই এসব বিরাষ্ট্রীয়করণ উদ্যোগ চলছে। শ্রমিক সংগঠকরা এসব কারখানার অবকাঠামো নবায়ন করে চালু রাখার দাবি জানিয়ে আসছিলেন বরাবর।

এদিকে বিরাষ্ট্রীয়কৃত কারখানার শ্রমিকদের আইনসম্মত পাওনার জন্য বছরের শেষ মাসগুলোতে শ্রমিকদের আন্দোলন করতে দেখা যায়। পাশাপাশি তাদের শ্রমিক কলোনি ছাড়তেও বলা হয়।

-

The labor sector in Bangladesh: Trends of 2020

2020 was a difficult year for the labor/working people of Bangladesh as hundreds and thousands have lost their jobs while many others faced wage cuts due to the adverse impact of Covid-19 pandemic on all sorts of economic activities. In the wake of the Covid-19 pandemic, the workers have fallen from the fragile life of the past into even more fragility. In the face of collective attack of fear of illness, unemployment and the financial crisis have left millions of working families in disarray.

The beginning of the Covid-19 pandemic

Covid-19 hit the country in March. Unfortunately, the United States, Italy, Singapore and many other countries where expatriate Bangladeshi workers are employed also hit by this pandemic at the same time. As a result, the working people of Bangladesh suffered both at home and abroad. So the workers at home as well as overseas migrant workers confronted danger.

As of 27 October, 1,972 Bangladeshis have died of Covid-19 in about 21 countries. In many countries, the share of the people of Bangladesh among the dead is quite high. For example, out of 5,296 people died of Covid-19 in Saudi Arabia, 750 are Bangladeshis.

On the other hand, at the same time, the number of deaths in Bangladesh was abouto seven thousand. There is no specific data of the number of the workers among the total deaths. However, the share of working people is estimated to be higher among the total death in Bangladesh. Because even in the face of the pandemic, they had to go out to earn a living and still they are doing.

Meanwhile, a joint study by the government's Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR) and ICDDRB, released in October, found that about three-quarters of Dhaka's slum dwellers were already infected. This study provides some clear indications of the

devastation made by Covid-19 among working people's families.

In a poor and profit-oriented health system, the financially weak and politically powerless people, including the workers, are in inhuman suffering during the pandemic. At that time it became difficult to get normal services for the treatment of health problems other than Covid-19.

Unemployment increased 10 times at one stage

The livelihood of people especially working class is the worst victim of Covid-19. The pandemic has left millions unemployed. From domestic workers to employees of multinational companies, the employers have not missed the opportunity to fire anyone. Huge number of people in almost all sectors have been losing jobs continuously since March. The domestic workers had faced the biggest blow of Covid-19. At the beginning of the pandemic, the doors to the workplace of millions of domestic workers were immediately closed. They were treated like untouchables overnight.

In small and medium enterprises, many employers reduce the wages on the pretext of closing factories, stop paying wages or fire many from their jobs. Similar incidents also have taken place in large scale industries. A survey by Manusher Jonno Foundation found that 91 percent of garment workers said they did not receive full pay at the start of the Covid-19. It is exposed in the pandemic that it is needed more legal protection and social security for workers in Bangladesh.

A massive new number of population became poor

Poverty has increased massively during Covid-19 pandemic. At the end of the year, there was a debate among government and various non-government organizations, civil society groups and academia on increase of poverty. Before pandemic, at the end of 2019, the poverty rate in the country was about 20 percent. But according to the Planning Commission of the government, the poverty rate during Covid-19 has risen to

29 percent. According to a joint study by Power and Participation Research Centre (PPRC) and Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) in June, poverty has risen to 43 percent. Another study by Centre for Policy Dialogue (CPD) claimed that the rate has risen to 35 percent.

According to a survey by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), the monthly income of a family has decreased by around Tk 4,000 to Tk 15,000. It said that people's income during Covid-19 has decreased by 20 percent. Before Covid-19, the average monthly income of each family was Tk 19,425 in March. In August, it dropped to BDT 15,492. The BBS released the survey report in the first week of October. According to the results of the survey, the demand for consumption has also decreased as the income of the families has reduced. In March, the average monthly expenditure per family was BDT 15,403. In August it decreased to BDT 14,119. About 6 percent of the households surveyed said they had financial problems during Covid-19 in one way or another. In other words, more than two-thirds of the families were financially distressed while trying to make a living during the pandemic. The same agency said in its survey that unemployment would rise 10 times after March. They also claimed that it reduced a bit by September. According to BBS, the unemployment rate in March was 2.3 percent. In July, it increased to 22.39 percent. But in September, the unemployment rate dropped to 4 percent.

According to the rules of the International Labor Organization (ILO), if a job seeker does not get the opportunity to work for at least one hour a week, they are considered unemployed. BBS has mentioned the above information about unemployment on the basis of that calculation. Taking this definition of unemployment more conservatively, it is not difficult to predict the huge unemployment in the country in 2020.

Taking advantage of Covid-19 pandemic, financially strong and affluent sectors started either retrenchment or reduced wages. For example, in the name of reducing expenses during this time many banks took the initiative to reduce the salaries and allowances of their employees. However, some banks declared that their salaries and allowances would not be reduced.

Social inequality increased further

Meanwhile, despite the increase in unemployment and poverty among the workers due to the pandemic, some people in the country were economically flourished. As proof of this, 3,412 new multimillionaire accounts in the country have increased in the midst of tumultuous corona. In March 2020, the account was 82,625. Three months later, in June, it increased to 86,037. A detailed report has been published in the media.

It is to be mentioned that the measure of a country's income inequality is the Guinea Coefficient. In 2006, the Guinea coefficient in the country was 0.32 percent. After 10 years, it has been increased to 0.49 percent. This is worrying in terms of income inequality. The lives of the workers are at one end of such a stake. According to a June 20 report in the daily *The Business Standard*, the value of the Guinea coefficient in the country was 0.24 in 1974. In 2010 it increased to 0.458. In 2016, it increased to 0.483. Now it has increased even more. Because of this, the richest five percent families own about 26 percent of the total income of the country. But the bottom five percent families own only 0.23 percent. (*Sarabangla*, 17 October 2020)

Wage deprivation of workers specifically are associated with these aspects of wealth inequality. This year an attention-grabbing movement over wages organized in the tea gardens amid covid-19. As a result, there has been an assurance to increase the daily wage from BDT 102 to BDT 120. Although tea workers demanded a daily wage of BDT 300.

New wave of denationalization

In 2020, new initiatives of denationalization in the industrial sector have further accelerated this trend of income inequality. A good example of this initiative was the closure of about 25 factories in the jute sector at a time. Besides, there were fear of withdrawing government investment from sugar mills at the end of the year. Due to the closure of jute mills, 20 to 25 thousand workers became unemployed at a time. In addition, many people involved in the production and marketing of jute and its related services are feared to be unemployed. The government is taking these types of denationalization initiatives mainly by showing the continuing losses as the reason – there are several studies in surface on how this sector can become a profitable one. However, even two months after the closure of the factories, not all the workers were given their due wages. As a result, there was dissatisfaction in various labor zones, including Khulna. In regards to sugar mill, Mr. Nurul Majid Mahmud Humayun, Minister of Industries, said (*The Daily Star*, October 1, 2020) that the sugar mills would not be closed or workers would be laid off. Instead, efforts are being made to make the sugar mills profitable by modernizing them and providing alternative income.

The present compilation contains individual detailed data-based reports on the above mentioned labor trends of 2020. These reports attempt to give a general picture of how miserably working people have toiled 365 days throughout the year.

-

The dynamics of the labor sector in recent years

[Although the scope of the labor sector in Bangladesh continues to grow, there is very little discussion and debate about the trend of this sector. In order to fill that gaps, from this year and onwards, the reviews on trends of labor dynamics will be highlighted regularly in this publication. This year we primarily have tried to identify the direction of this dynamic against few indicators- Editor]

Budget Analysis: Lack of importance to the labor sector in financial allocations

The main document of the national economy in Bangladesh is the annual national budget. The two main ministries in the labor sector are the Ministry of Labor and Employment and the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment. From 2017-18 to current fiscal year, the allocations of these two ministries in the national budget are as follows: (sources: Budget speech by the Finance Ministers in different years)

As can be seen from the above allocation table, in the four years:

(a) The allocation for the Ministry of Labor and Employment has increased by around 31 percent. (b) On the other hand, the allocation for the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment has been reduced by around 7 percent. At the same time, the share of labor and employment in the national combined allocation of 0.6 percent in 2016-17 has remained the same even after four years. As we see no increase. On the other hand, the share of expatriate welfare allocation has stood at 0.11 percent in the last budget from 0 .17 percent four years ago. That is reduced.

From the above budget trends of the two ministries, it can be presumed that the labor sector is getting very little attention in terms of national allocations. The share of ministries concerned with the interests of the workers has not increased as part of the annual national

Year	Budget Allocation for the Ministry of Labor and Employment (In Crores-BDT)	Budget Allocation for the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment (Crores-BDT)	Combined allocation for all Ministries and Departments (Crores BDT)
2017-18	268	688	400,266
2018-19	227	595	464,573
2019-20	313	591	523,190
2020-21	350	642	568,000

allocation. However, the allocation for the Ministry of Labor has increased slightly in terms of quantity in the last four years.

Wage inequality and wealth inequality

In the last five decades after independence, the size of Bangladesh's economy has increased almost three hundred times. Poverty has decreased a lot. The trend of growth was also at satisfactory level till the country was hit by the Covid-19 pandemic. But the benefits of this growth are not seen to be reflected too much in the economy of the lower strata of society. The Seventh Five-Year Plan clearly states, "Inequality in society continues unabated."

Wage inequality: A comparison between the public sector and the garment industry

The 'total wage' of a seventh grade worker in the garment factory, the largest industrial sector in Bangladesh, has been fixed at BDT 8,000 in 2018; in which the basic wage is BDT 4,100 . In 2013, the total wage was BDT 5,300 where the basic wage was BDT 3,000. In other words, after 5 years, the basic wage has increased by BDT 1,100 Taka. Even before that, the total wage in the garment sector was BDT 3,000. It means, in the ten years from 2010 to 2020, in regard to scale up the wages of garment workers in the lowest grade increased from BDT 3,000 to BDT 8,000 means 166 percent increased. It is to be noted that the salary of government employees has increased by about 221 percent from FY 2011-12 to FY 2020-21 (*The Prothom Alo*, June 25, 2020).

In other words, the workers are stuck in the cycle of low wages. On the other hand, the rise of government employees' salaries is happening in the cycle of high salaries. In 2015, the government announced a new wage structure for the government employee which includes BDT 8,250 as basic salary in the lowest grade among the 20 grades. At that time, the basic salary of a garment worker in the lowest grade was BDT 3,000. This means at the same time, the lowest-paid government employees were paid almost three times as much as the lowest-grade garment workers. This gap must have widened further in the next pay rise initiatives. In the current salary structure for government officials, the basic salary is up to BDT 86,000 (Chief Secretary). Government employees also receive various benefits. Among the people›s representatives of the country, the Members of Parliament (MPs) get only BDT 55,000 monthly honorarium among many other facilities. Overall, the wage gap between workers and others in society is huge. It can be said that wage marginalization of workers has been institutionalized in Bangladesh.

Resource inequality

Like wage inequality, workers are also victims of extreme wealth inequality. As of 2019-20, the average per capita income in Bangladesh is USD 2,064. In terms of Bangladeshi currency, it is around BDT 170,000. But this calculation is extremely meaningless for the workers. Because many of them do not earn even BDT 100,000 throughout the year. Such deprivation of income has also deprived them of their wealth. According to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), the wealth of 5 percent of the poorest Bangladeshis was 0.78 percent of the total wealth of the country in 2010. In 2016, it has decreased to 0.23 percent. On the other hand, the wealth of the richest Bangladeshis has increased from 24.61

percent to 27.82 percent in 2016 at the same time. Needless to say, this gap has widened in recent years.

The wage 'increase' trend is not consistent with the poverty alleviation program (in the tea sector and in the garment sector).

In this case, we try to understand the direction of the situation from the examples of two export-oriented industries in Bangladesh. The last wage increase for workers in garment factories, the largest industrial sector in Bangladesh, happened in 2018. The 'total wage' of a seventh grade worker has been fixed at BDT 8,000 ; the basic wage is BDT 4,100 . In 2013 it was BDT 3,000. In other words, after 5 years, the basic wage has increased by BDT 1,100. In these five years, inflation in the country has been at an average rate of 5-6 percent. As such, it is questionable how much the real wages of garment workers has been increased.

Year	Monthly gross wage	Monthly basic wage
2018	8,000	4,100
2013	5,300	3,000
2010	3,000	2,000

On the other hand, a new wage structure was also announced in the tea sector in 2018. At that time, the daily wage of a worker has increased from BDT 85 (fixed in 2015) to BDT 102 (subject to lifting 20 to 23 kg of leaves!). Wages have increased by BDT 510 for 30 days. In other words, after three years, the wage of one worker reaches to BDT 3,060 by increasing BDT 510 per month. The picture of wage increase in the tea sector is as follows:

Year	Daily wage	Monthly wage
2018	102	3060
2015	85	2550
2013	69	2070

On the other side of the Sylhet border, the wage for the tea sector in Assam is Rs 145 in Barak Valley and Rs 167 in Assam Valley. On the other

hand, Sri Lanka, another tea-producing country in South Asia, has a daily wage of USD 5. The latest update is that in 2020 the daily wage in this sector in Bangladesh has been fixed to BDT 120 by increased BDT 18 (BDT 3600 per month).

Contribution of workers to the national economy (garment sector and expatriate labor sector)

We have seen above what the workers are getting in the budget allocation of Bangladesh. That receipt is very small and relatively marginal as per the calculation of the ministries. But the workers are the most advanced in contributing to the national economy. The two main sources of foreign currency in Bangladesh are remittances from expatriate workers and income from readymade garments exports. The combined contribution of these two sectors to the GDP is about 25 percent. About 12.5 million Bangladeshis are working abroad now. And about 4 million workers are working in the garment sector. In other words, around 16.5 million expatriate and garment workers are collectively contributing to the country's economy. Both sectors only have flourished every year before the pandemic Covid-19. Globally, Bangladesh is among the top five countries in terms of expatriate workers' income. Bangladesh is also among the first 2-3 countries in terms of income from the garment sector. The share of the garment sector in export income is 60 percent. Forty percent of the port authority's revenue is related to garment products. About 40 billion dollars export income from this sector. And expatriates send about 18 billion dollars to the country. In other words, the economy of these two sectors together is about 60 billion dollars. Which is directly achieved by the contribution of the workers in Bangladesh.

No major improvement in the workplace safety: an analysis of 3 years

A major source of crisis in workers' life in Bangladesh is occupational health crisis and insecurity. There are many examples of accidents, especially at work and on the way to or from work. The decent work environment is really elusive for the workers in Bangladesh. Incidents like Rana Plaza remain as a witness of it. A scenario of workers' death in the workplace over the past years compiled by Safety and Rights (SRS) on the basis of newspaper report is given below-

Year	Number of death of workers
2014	320
2015	373
2016	382
2017	437
2018	593
2019	572
2020	432

The figure above shows the gradual increase in the number of deaths of workers in workplace accidents. In recent years, the transport and construction sectors have been seen to be at the forefront of such accidents.

Freedom of assembly: A tragic situation

The most important indicators of workers' rights are freedom of assembly and association. But the labor sector has very little achievement in terms of such freedom. Although there is a legal provision to form a union with the consent of

20 percent of the workers at the factory level, in reality it has been made difficult. Among the first tier industries, the elected representatives of workers in the tea and leather sectors can negotiate on wages and other issues, but in the garment sector, the main industrial sector of the country, does not have such opportunity to bargain for their rights centrally. Even very small numbers of factories have active unions. Labor organizers claim that the number of organized workers in this sector is no more than one percent. Garment owners claim the number is 10 percent. However, reliable media reports indicate that among the 4,000-5,000 garment factories, only 500 to 600 have unions though in documents. In other words, institutionally, this sector has been largely deprived of the right to form associations. At the same time, this status is in conflict with ILO Conventions 87 and 98 (Freedom of Association and CBA). Bangladesh is a signatory to these charters. However, according to the comment of the workers' organizers, the workers are sacked as soon as they take the initiative to form a union. Even they are also ousted from their living place. But Article 38 of our constitution has given the right to the citizens to form an association. Many of the industrial disputes can be settled through bilateral and tripartite negotiations if the responsible trade unions are active at the factory level. Then we do not need to call the police for every matter.

The Labor Act of 2006 has provision to form a Workers Participation Committee consisting of employers and workers representatives at the factory level. Recently, we observe a trend to use this provision as an alternative to trade unions in the garment sector. Workers do not consider this committee to be the real representative union. In their view, as there is no traditional trade union, the provision of joint bargaining as entitled in the labor law is not being followed properly.

Speed in denationalization

In 2020, there is a new wave of denationalization in the state-owned industry. In the jute sector, 25 factories were shut down simultaneously. Then there were fears that the sugar mills would also be shut down. These denationalization initiatives are going on mainly because of losses as claimed by the government. The workers' organizers have been demanding running of these factories through renewal of the infrastructure of these factories.

-

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি

র‍্যাংগস শ্রাবন্তি, ৬/৫ এ, স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০

info@safetyandrights.org
safetyandrights.org
Safety and Rights Society
Safety and Rights Society